খেলা

২৪ জানুয়ারি, সংখ্যা ১৯৮৬



সানি কি শেষের ছবি আঁকতে চাইছেন?



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


কাহিনী ও উপস্থাপনা 'দি টীম'
সানি
৫৮
শিল্পী: মানস চৌধুরী
সহকারী: কানাই, অংশুমান, বুম্বা
সহযোগিতায়: বগন, সুশান্ত, নারাণ
১৯৭৬ এ নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যুগ্ম সফরে ভারতীয় টীম ঘোষণা: এই দলে নতুন মুখ সুরিন্দার অমরনাথ, সৈয়দ কিরমানি ও দিলীপ বেংসরকার। বিষাণ সিং বেদি অধিনায়ক সহ অধিনায়ক সুনীল মনোহর গাভাসকার।
নিউজিল্যান্ড যাত্রার পূর্বে সানির প্রথম মারাঠি ফিলম "প্রেমচি সাওলিতে" তাঁর অভিনয়ের শেষ অংশটুকু সমাপ্ত করলেন
কাট্
দুর্দান্ত হচ্ছে সানি, চালিয়ে যাও। ফিল্ম হিরো হিসেবে ও তুমি সেঞ্চুরি করবে।
ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ড পৌঁছল ২৪ জানুয়ারি অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে শুরু হল প্রথম টেস্ট বেদি অসুস্থ থাকায় সানি হলেন অধিনায়ক। টসে জিতে গ্লেন টার্নার ব্যাটিং নিলেন
আমরা দুঃখিত
৫৮ নম্বর কমিক স্ট্রিপটি ছাপা হওয়ার কথা গত ১০ জানুয়ারি সংখ্যায়। ভুলবশত ১০ এবং ১৭ জানুয়ারি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে যথাক্রমে ৫৯ ও ৬০ নম্বর 'কমিক্স স্ট্রিপ'। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। এ সংখ্যায় বাদ পড়া ৫৮ নম্বর স্ট্রিপটি দেওয়া হল।
সম্পাদক
জে এফ এম মরিসনের সংগে গ্লেন টার্নার ইনিংসের সূচনা করলেন। চন্দ্রশেখরের এক চতুর গুগলিতে এবং সানির নেওয়া এক দুর্দান্ত ক্যাচে আউট হয়ে ড্রেসিং রুমে টার্ন ব্যাক করলেন গ্লেন টার্নার।
আম্পায়ারদের অশেষ করুণা সত্ত্বেও চন্দ্রা আর প্রসন্নর ভয়াবহ বোলিংয়ে নিউজিল্যান্ড নেতিয়ে পড়ল ২৬৬ রানে। ৩০–৬–৯৪-র গড়ে চন্দ্রা নিলেন ছটি উইকেট। ২৫–৫–৬৪-র গড়ে প্রাস নিলেন তিনটি উইকেট।

খেলা

২৪ জানুয়ারি বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪৭

আজকাল প্রকাশনের খেলার কাগজ

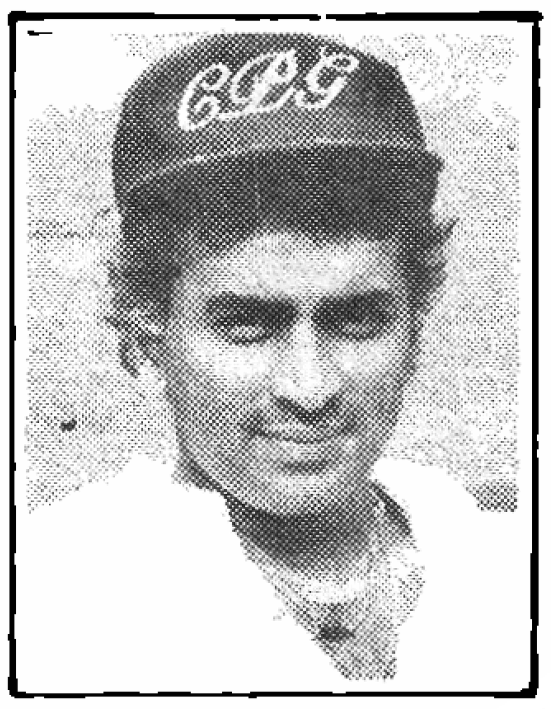
সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদের ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা অনিত ভোস

অন্যান্য ছবি শান্তি সেন, প্রদীপ সোম, জহর রায়, শ্রেণিক শেঠ, রাজা ধর, সুমন চট্টোপাধ্যায় বিকাশ সাধু, সদ্যুৎ দে, অমিয় তরফদার এবং এস এস কাঞ্জিলাল।

প্রচ্ছদে সুনীল গাভাসকার



সিডনী টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই সানি গাভাসকার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে বলেন, বিদায় নেবার এটাই উপযুক্ত সময়, তিনি আর, একটিও টেস্ট খেলতে চান না। সম্ভবত, তার পর দিনই ওই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হত, যদিনা ম্যানেজার বেংকট-রাঘবন মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। তিনি নিজে সানিকে বলেন, আরও অনেক ভেবেচিন্তে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবাই উচিত নয়। বেংকট বোর্ড সভাপতি শ্রীরামনকে সানির মনোভাব জানান। শ্রীরামনও সানিকে বলেন, ভারতীয় ক্রিকেটকে ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য, তাঁর অন্ততঃ ছিয়াশির ইংল্যান্ড সফর পর্যন্ত খেলে যাওয়া উচিত। হয়ত বোম্বাই ফিরে গাভাসকার জানাবেন, তিনি কী করবেন। সানির বাবা মনোহর গাভাসকারের সংগে আমাদের কথা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা, সানির ক্রিকেট জীবনের শেষ ছবি আঁকা হক ছিয়াশিতে ওভালেই, আটত্রিশ বছর আগে যেখানে বিদায়ের বিষণ্ন ছবি এঁকেছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান।

অশোক দাশগুপ্ত

প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক কম্পু-কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলিকাতা–৯ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। ফোন: ৩৫–৩৬৭২, ৩৫–৫৩০২, ৩৫–৫৪৮৪

দাম– ২ টাকা। বিমান মাশুল– ত্রিপুরা, প্রতি কপি ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যস্থানে ২৫ পয়সা।

ছিয়াশিতে অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের ক্রীড়াসূচী

অস্ট্রেলিয়ায় সফর করছে এখন ভারত। আর আগামী সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া আসছে ভারত সফরে। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ১৭ জানুয়ারি, ভারত সফরের ক্রীড়াসূচী ঘোষণা করেছে

২–৪ সেপ্টেম্বর :	বনাম বোর্ড সভাপতি একাদশ (বাঙ্গালোর)
৭ সেপ্টেম্বর :	একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ (জয়পুর)
১০–১২ সেপ্টেম্বর :	বনাম অনূর্ধ ২৫ বছর বয়সীদের একাদশ, চন্ডীগড়
১৪ সেপ্টেম্বর :	দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, শ্রীনগর
১৮–১২ সেপ্টেম্বর :	প্রথম টেস্ট ম্যাচ (মাদ্রাজ)
২৮ সেপ্টেম্বর :	একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ (হায়দরাবাদ)
২৬–৩০ সেপ্টেম্বর :	দ্বিতীয় টেস্ট (নয়াদিল্লি)
২ অক্টোবর :	একদিনের আন্তর্জাতিক (কলকাতা)
৫ অক্টোবর :	একদিনের আন্তর্জাতিক (আমেদাবাদ)
৭ অক্টোবর :	একদিনের আন্তর্জাতিক (রাজকোট)
১০–১২ অক্টোবর :	রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন (বরোদা)
১৬–২০ অক্টোবর :	তৃতীয় টেস্ট (বোম্বাই)



মিঃ গাভাস্কার, প্লিজ স্টপ ইট !

মিঃ গাভাস্কার, আপনি একি শুরু করেছেন। ক্রিকেট হচ্ছে গৌরবময় ঐতিহ্যের খেলা। যার বাঁকে বাঁকে রেকর্ডের জোয়ার। একজন রেকর্ড গড়বে, একজন তা ভাঙবে- এই নিয়েই ক্রিকেট এগিয়ে চলেছে শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে। রেকর্ড গড়া আর রেকর্ড ভাঙা এটাই ক্রিকেটকে বৈচিত্রময় করে রেখেছে। যার আকর্ষণে মানুষ সব কিছু ভুলে ছুটে যায় মাঠের পানে, কান পেতে রাখে রেডিওতে। কিন্তু ক্রিকেটের এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে আপনি আজ হত্যা করতে চলেছেন। আপনি নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙতে ভাঙতে তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন যা ভাঙা এই শতাব্দীর ক্রিকেটারদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। আপনার রেকর্ড ভাঙতে হলে আগামী শতাব্দীতে আমাদেরকে মংগলগ্রহ থেকে কোন দানব ক্রিকেটারকে বার করে আনতে হবে। তাই বলছিলাম, এবার আপনি ক্ষান্ত দিন। মিঃ গাভাস্কার, প্লিজ স্টপ ইট।

মোঃ জিন্নুর রহমান
গ্রন্থাগারিক
রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

একটি খোলা চিঠি !

প্রিয় বাবুরাম সাপুড়ে,

আপনি অনেক কিছুই লক্ষ্য করে থাকেন, নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক কিছুই লেখেন। কিন্তু এটা কী লক্ষ্য করেছেন যে, আপনার চেয়ে অনভিজ্ঞ অনেক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার এই পত্রিকায় অনবরত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু আপনি উপেক্ষিত। আপনি এই 'ইস্যু' নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিন। পারতপক্ষে অন্তত একটা লেখা এই বিষয়ে ছাপিয়ে দিন। তা অবশ্য এই পত্রিকায় সম্ভব নয়। কারণ, কোন্ সম্পাদক আর নিজের বিরুদ্ধে নিজের পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করবেন। তার চেয়ে আপনি বরং আপনার সেই অপ্রকাশিত পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশ করবেন।

রেখা ঘোড়ই,
তমলুক, মেদিনীপুর।

আড়াই মাসের ব্যবধানেই !

১১ অক্টোবর ১৯৮৫ সংখ্যার প্রচ্ছদে চিমা ওকেরির ছবি ছাপান হয়েছিল। আবার ২০ ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদেও চিমার ছবি দেখলাম। মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে দুবার প্রচ্ছদে চিমার ছবি ছাপাবার কারণ কি ? আর কি কোনও খেলোয়াড় নেই, যাঁদের ছবি ছাপান যেত ?

অসিত দাস,
সূর্যসেন নগর, খড়দহ

অসাধারণ !

কেন জানি না, 'খেলা'য় মাঝেমধ্যেই সুরজিৎ সেনগুপ্তের 'হ-য-ব-র-ল' অনুপস্থিত থাকে। ৩ ও 10 জানুয়ারি সংখ্যা দুটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে, 'হ-য-ব-র-ল'-র অনুপস্থিতি ভুলিয়ে দিল অন্য স্বাদের 'এক গোলে হেরে বা ড্র করে খুশি থাকার মানসিকতা ঝেড়ে ফেলা উচিত' লেখাটি। ভারতীয় ফুটবলের চুলচেরা বিশ্লেষণে, স্পষ্ট বক্তব্যে লেখাটি অসাধারণ।

ঝুমা মজুমদার,
সল্ট লেক, কলকাতা-৯

জয়গান করবই

২০ ডিসেম্বর সংখ্যায় আমার প্রিয়তম ফুটবলার কৃশানু দে সম্পর্কে সময়োপযোগী পাঁচটি লেখা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। জেনে অবাক লাগে, কৃশানুর মত ফুটবলারকেও কোনও কোনও কোচ 'ও আবার ফুটবলার নাকি' বলতে চেষ্টা করেন। বিশেষ-অজ্ঞরা যাই বলুন, আমরা কৃশানুর ফুটবল শিল্পের জয়গান করবই।

অরূপ মুখোপাধ্যায়
ধানবাদ বিহার

তৃতীয় জন কে ?

'খেলা'র ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায় আপনার লেখা 'ওর মাথা ঘোরে নি' পড়লাম। আপনি তিনজন কোচের কথা লিখেছেন, যাঁরা কৃশানুর খেলার মধ্যে ত্রুটি বের করার চেষ্টা করেছেন। উল্লেখ না করলেও, দুজন কোচের নাম বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন পি কে ব্যানার্জি ও অমল দত্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তৃতীয়জন কে ? প্লিজ, জানান। তাঁকেও একটু চিনতে দিন।

অনুপম বসু
রানীগঞ্জ, বর্ধমান

মাথা একদমই ঘোরে নি

খেলা-র ১৯৮২-র ১ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় উঠতি ফুটবলার কৃশানু দে সম্পর্কে তিনটি লেখা প্রকাশিত হবার পরই কথা উঠেছিল 'অত প্রশংসায় কৃশানুর মাথা ঘুরে যাবে।'

তার তিনবছর পর, ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায় কৃশানুর সাক্ষাৎকারটি পড়ে দেখা যাচ্ছে কৃশানু দে কথাবার্তায় অনেক পরিণত হলেও, তাঁর মাথা ঘোরে নি। ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দূরদর্শন মারফৎ ভারত নেপাল ফুটবল ম্যাচে (সাফ গেমস)

কৃশানুকে যেভাবে দুটি গোল করাতে দেখলাম..... না, না, প্রশংসায় মাথা ঘুরে গেলে তা সম্ভব হত না।

মহুয়া নন্দী
পানিহাটি ২৪ পরগনা

ভাবা যায় না !

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, আপনাদের অনুরোধ করছি, ৩ জানুয়ারি সংখ্যার 'সাংবাদিকের ডায়েরী' বের করে শেষ অংশটি আরও একবার পড়ুন। ঐ সংখ্যায় ঐ ফিচারে ছিলেন শ্রেণিক শেঠ। সানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সানি অধিনায়ক থাকাকালীন ভারতীয় দলের সাজঘরে ঢুকে অনায়াসে ছবি তুলতেন শ্রেণিক। তিরাশির বিশ্বকাপে সানি অধিনায়ক ছিলেন না। তাই তিনি শ্রেণিককে ডেকে বারণ করেছিলেন, যখন তখন সাজঘরে আসতে। কারণ অন্য কেউ কোনও কথা শ্রেণিককে বললে সানি আঘাত পাবেন। ভাবতে পারেন, কতটা ভালবাসা থাকলে একজন সাংবাদিককে একজন ক্রিকেটার এমন আন্তরিক কথা বলতে পারেন !

অসিতবরণ দত্ত,
সুদামডি, ধানবাদ

রাতের কোনও চিহ্নই নেই

দেরিতে হলেও নববর্ষের অভিনন্দন 'খেলা'র সম্পাদক, সাংবাদিক এবং কর্মীদের।

বত্রিশতম শতরানের জন্য সুনীল 'রানমেকিং' গাভাসকারকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন। ছিয়াশির শুরুতেই এই অভিনব ইনিংসটি আগামী অনেক উজ্জ্বল ব্যাটিং সাফল্যের আগমণী বলেই মনে হয়। কোথায় থামবেন ছত্রিশোর্ধ সানি ? আমার মনে হয়, দশ হাজার রান এবং একশ ক্যাচের (সেঞ্চুরি আরও কয়েকটি বাড়বেই) লক্ষ্যে তাঁর অচঞ্চল পদক্ষেপ তিনি নিজে (স্বেচ্ছাবসর) ছাড়া কেউ থামাতে পারবে না। আবার বলি, হ্যাটস অফ টু সুনীল গাভাসকার।

২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় সানির 'ওয়ান ডে ওয়ান্ডার্স'-এর মনোজ্ঞ ব্যঙ্গ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা পেয়ে গেছি 'সেভেন পেজ ওয়ান্ডার্স'। পঁচাশির শেষ প্রহরে দীর্ঘতম (এবং শ্রেষ্ঠ?) লেখাটি বেরিয়ে এল অশোক দাশগুপ্তর কলম থেকে। অসাধারণ টুকরো কাহিনীর গাঁথা মালা আরও অসাধারণ করে তুলেছে এই কলম। তবে, এই লেখাটি নিয়ে আমার একমাত্র আপত্তিটি হল শিরোনামে। এই সাত পাতার লেখা ও তার বিষয়বস্তু – সর্বত্রই রৌদ্রের ঝলকানি, রাতের কোনও চিহ্নই কোনওখানে নেই।

দেবাশিস সেনগুপ্ত,
বাকসাড়া, হাওড়া-৬

এক দিনের এক নম্বর

অশোক দাশগুপ্ত

দুদলে ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের তুলনা নেই। দেশের রাজনীতিতে হাজার দল থাকলেও, মনে মনে আমরা সব ব্যাপারেই মূলত দ্বিদলীয় প্রথায় ঘোর বিশ্বাসী। গাভাসকার বড়, নাকি বিশ্বনাথ ? এই নিয়ে কত আড্ডা উষ্ণ হয়েছে, ভেঙেও গেছে কিছুকাল আগে। গোটা দুনিয়ার স্বীকৃতিধন্য দুই ব্যাটসম্যান একই সঙ্গে খেলে যাচ্ছিলেন ভারতীয় দলে, এই ব্যাপারটায় গর্বিত হওয়ার চেয়ে অনেকেই বৃথা তর্ক বাঁধানর উৎসাহ বেশি পেয়েছেন – কে বড়, সানি না ভিশি ? সানি ভক্ত নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন, ভিশি সানির সঙ্গে তুলনাতেই আসতে পারেন না। ভিশিভক্ত নির্বিকার মুখে মন্তব্য করেছেন, একটু ধৈর্য থাকলে সানির রেকর্ড হাসতে হাসতে চুরমার করে দিতেন ভিশি। যেন সানি ভক্তের ভিশিভক্ত হতে নেই, ভিশিভক্তের সানি ভক্ত হওয়া অপরাধ! ব্যাপারটা কখনই ভারতীয় দলে ছায়া ফেলেনি, কারণ দুই সেরা ব্যাটসম্যান ব্যক্তিগতজীবনে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও। গাভাসকার বারবার বলে গেছেন, বিশ্বনাথ তাঁর চেয়ে ঢের বড় ব্যাটসম্যান। বিশ্বনাথ বলেছেন, গাভাসকারের কাজটা সব সময়েই অনেক বেশি কঠিন, কারণ নতুন বলটা তাঁকেই খেলতে হয়। তাঁর সঙ্গে সানির তুলনা অর্থহীন, সানি দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান।

সানি-ভিশির ক্ষেত্রে যা ঘটেনি, তা ঘটল সানি-কপিলের ক্ষেত্রে। দেশের সাধারণ ক্রিকেট-অনুরাগীরা ভাগ হয়ে গেলেন পরিষ্কার দুই দলে সানিভক্ত এবং কপিল ভক্ত। সানিভক্তরা কপিলদেবকে 'উত্তর ভারতীয় নির্বোধ' পর্যন্ত বলতে রাজি, কপিলভক্তরা সানিকে ভাবেন 'পশ্চিমী ধুরন্ধর' সানি বলেন, কপিলদেব ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিডিয়াম পেসার, তাঁর জায়গা আলেক বেডসারের পাশেই। সানি মনে করেন, চেষ্টা করলে কপিল একজন প্রথম সারির আন্তর্জাতিক ব্যাটসম্যানও হতে পারতেন। কপিলদেব বলেন, ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান গাভাসকার, তিনি 'আমাদের ডন' 'ভারতে তিনিই মিঃ ক্রিকেট।' পারস্পরিক প্রশংসা ও মূল্যায়নে দুজনই আন্তরিক, কিন্তু তারপরই গন্ডগোল। ভারতীয় ক্রিকেটের দুর্ভাগ্য, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই দুই ভারতীয় ক্রিকেটার নিজেদের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য কে দায়ী, অথবা কে বেশি দায়ী তা যে যার নিজের মত করে ভেবে নেবেন।

অধিনায়ক হয়েই কপিলকে টীমের এক নম্বর বোলার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে দশ পা এগিয়ে এসেছিলেন গাভাসকার। কপিলের ক্রিকেটজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁকে বলতে গেলে লালন করেছেন গাভাসকার। সেই কপিলই ক্ষমতায় এসে কি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে ফেলেছিলেন ? নিজেকে উজাড় করে দিয়ে অধিনায়ক গাভাসকারের হাতে অনেক ম্যাচ তুলে দিয়েছেন কপিলদেব। এই কপিলদেবের প্রতি কি পরবর্তী কালে গাভাসকার কখনও কখনও অতিরিক্ত শীতল মনোভাব দেখিয়ে ফেলেননি ? এসব প্রশ্ন থাকবে এবং নিষ্পত্তি ছাড়াই বারবার আলোচিত হবে।

কখনও কখনও এই আলোচনার মধ্যে থেকেও এই লেখকের সৌভাগ্য, দ্বিদলীয় চিন্তার মধ্যে নেই। আমি সানি গাভাসকারের সবচেয়ে বেশি গুণমুগ্ধ, কিন্তু সেই সঙ্গে গুণমুগ্ধ কপিলদেব নিখাঞ্জেরও। আমি বিশুদ্ধ ক্রিকেট তাত্ত্বিক নই। বিশেষজ্ঞরা প্রত্যেক ক্রিকেটারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। সাধারণ ক্রীড়ানুরাগীদের মতই এই লেখকের মধ্যে কাজ করে অন্তহীন আবেগ। আগে এই আবেগই আমাকে কপিলদেবের ভক্ত বানায়, তারপর যথাসম্ভব বিশ্লেষণ বোঝায় – আন্তরিক আবেগ কখনও ভুল পথে নিয়ে যায় না।

আশা করি, আপনারা আমার ক্রিকেট বিশ্লেষণ খানিকটা সহ্য করবেন, কেননা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজেকে জাহির করার ভন্ডামি দেখাচ্ছি না। একজন ক্রিকেট-অনুরাগী হিসাবে আমি এই দাবি তুলে ধরতে চাইছি যে, এক দিনের ক্রিকেটে দুনিয়ার সেরা ক্রিকেটার একজন ভারতীয়, তার নাম কপিলদেব। হ্যাঁ, আবেগ ও অনুভূতি। পার্থে সাম্প্রতিক ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি দূরদর্শনে দেখার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাই এই আবেগতাড়িত লেখাটির উৎস।

টসে হেরে সবুজ উইকেটে প্রথমে ব্যাট করতে হয়েছে কপিলের টীমকে। তিরানব্বইয়েই টীমের প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যান ফিরে গেছেন নন-স্ট্রাইকার্স এন্ড-এ সহ-অধিনায়ক, অধিনায়ককে এবার আর একটি ম্যাচ জেতান ইনিংস খেলতে হবে। হেডলির প্রথম বলেই ফ্লিক করার সময়ে বেশি ব্যাট মুড়ে ফেললেন কপিল, উল্টো দিকে লেগে সহজ ক্যাচ। ভারতীয় ইনিংসের অকালমৃত্যু মাত্র একশ তের রানে। নিউজিল্যান্ড দু উইকেটে ছিয়াত্তর। আমরা অলস, নিরাশ, প্রায় শূন্য দৃষ্টি মেলে রেখেছিলাম দূরদর্শনের পর্দার দিকে। দেখতে হয়, তাই দেখছিলাম। তাছাড়া, চ্যানেল নাইনে শোকের দৃশ্যও সুন্দর! কপিল এলেন দ্বিতীয় স্পেল-এ বল করার জন্য। ফিল্ড সাজানর সময় কপিলের মুখের দিকে তাকিয়েই মনে হল, অন্তত এই একজন তখনও মনে করছেন না যে খেলাটা শেষ হয়ে গেছে। তারপর, ভেবে দেখুন। শুধু এখন নয়, ভেবে রোমাঞ্চিত হতে হবে দশ বছর পরেও। পরপর তিন ওভারে তিনটি উইকেট নিলেন ভারত-অধিনায়ক, চেতনের বলে রাইট ফিরে গেলেন অবিশ্বাস চোখে মেখে, এমন ক্যাচ শুধু দক্ষতায় নেওয়া যায় না। অসাধারণ অনুমান ক্ষমতায় কিছুটা জমি পার হয়ে এসেছিলেন কপিল, তারপর শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং চূড়ান্ত দক্ষতায় বাতাস থেকেই সেই বল তুলে আনা। অনুমানক্ষমতা, শারীরিক সক্ষমতা এবং স্বাভাবিক দক্ষতা। এই তিনটির সমাহার ও সমন্বয়েই নেওয়া হয়েছে এই অবিস্মরণীয় ক্যাচ। একটু ভুল বললাম। এসব কিছুরই সঙ্গে ছিল প্রতিভার অমোঘ ছোঁয়া এবং নিজেকে নিঙড়ে দেবার ইচ্ছা। অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা। এই ইচ্ছারই নাম কপিলদেব। দ্বিতীয় স্পেল-এ খানিক পুরনো বলেও দু দিকে স্যুইং করালেন কপিল, ইচ্ছামতন ফেলে গেলেন দুর্ধর্ষ ইয়র্কার, তিন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানকে ঠেলে দিলেন স্লিপ ও চিকন মৃত্যুর দিকে। পরে নিলেন ম্যাকস্যুইনির ক্যাচও, আম্পায়ারের হাস্যমুখ নিষ্ঠুরতায় মাথা ঝাঁকালেন একবার, চেতনকে আরও ভাল বল করার জন্য তাতালেন, গোটা টীমকে কিছু না বলেও যেন বলে গেলেন: এস, লড়াই কর। ভারত জেতেনি। কিন্তু আমরা ক্রিকেটের এক মহান যোদ্ধার অবিস্মরণীয় সংগ্রাম দেখেছি। আমরা জিতেছি।

ফিরে আসছি দাবিতে: কপিলই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এক দিনের ক্রিকেটার। টার্নব্রিজ ওয়েলসের অপরাজিত একশ পঁচাত্তর, নাগপুরে গাওয়ারের টীমের বিরুদ্ধে এই বিধ্বংসী হাফ সেঞ্চুরি, বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপে এবং এবারের তিন দেশের সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতান ইনিংস – গর্বিত হওয়ার এবং করার মত ব্যাটিং কতবার করে গেছেন কপিল। পাঁচ, ছয় অথবা সাত নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জোরেই যে কোন আন্তর্জাতিক দলে অনায়াসে আসতে পারেন কপিলদেব। চেষ্টা করলে, টেস্ট ক্রিকেটেও প্রথম সারির আন্তর্জাতিক ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেন কপিল গাভাসকার লিখেছেন। সেই চেষ্টা ছাড়াই, এই মুহূর্তেও, এক দিনের ক্রিকেটে দুনিয়ার সেরা পাঁচজন ব্যাটসম্যানের একজনের নাম কপিলদেব।

সেরা পাঁচ বোলারের মধ্যেও একজন – এটা বললে হয়ত খুবই কম বলা হচ্ছে। কেনই বা আমরা অকারণে হতে যাব অতিরিক্ত বিনয়ী ? সাম্প্রতিক অতীতে টেস্ট ক্রিকেটে স্ট্রাইক বোলার হিসাবে অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মান থাকলেও, এক দিনের ক্রিকেটে কপিল কখনই হতাশ করেন নি। প্রথম স্পেল-এ পাঁচ ওভারে (কদাচিৎ ছয়) সাত-আট রানের বেশি তাঁর বলে নেওয়া কঠিন হয়েছে, চাপের মধ্যে পড়ে বিশৃঙ্খল ব্যাট চালিয়ে ব্যাটসম্যানরা কখনও কখনও উইকেট দিয়ে গেছেন কপিলের সঙ্গীদের। পরের স্পেলে পাঁচ ওভারে (কদাচিৎ চার) সামনে পেয়েছেন রানের জন্য উন্মত্ত ব্যাটসম্যান। ওই স্লগ ওভারগুলিতেও কপিল খুব বেশি রান দিতে চান নি, কিছু রান দিলেও তুলে নিয়েছে একাধিক উইকেট। আউট হয়ে গেলে ত আর মারকুটে ব্যাটসম্যানের পক্ষেও রান তোলা সম্ভব নয়! হেডলি, ইমরান এবং মার্শাল নিশ্চয় আধ দিনের ক্রিকেটেও ভয়ঙ্কর। কিন্তু এক দিনের ক্রিকেটে সেরা বোলার হিসাবে প্রায় সর্বজনস্বীকৃত জোয়েল গার্নার। আমরা তারপরই কপিলদেবকে রাখতে চাই। হেডলি-ইমরান-মার্শাল এক দিনের ক্রিকেটেও বিস্ময়কর বোলিং সাফল্য পেয়েছেন মাঝেমাঝে, কেননা যে বড় বোলার সে সব সময়ই, সব পরিস্থিতিতেই বড় বোলার। কিন্তু এক দিনের ক্রিকেটে ওদের বোলিং ফর্ম কপিলের মত ধারাবাহিকভাবে ভাল নয়।

ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ আউটফিল্ডার কপিল, ক্যাচ নেবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'নিশ্চিত' প্রায় মদনলালের মতই। বাউন্ডারি লাইন থেকে দ্রুত ও নিখুঁত বল ফেরত পাঠানতেও কপিল সেরা। সম্প্রতি স্লিপ এবং অন্য ক্লোজ-ইন পজিশনেও বেশ কিছু ভাল ক্যাচ নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আউটফিল্ডার হিসাবে কপিলকে ধরে নিতে বোধহয় ইংরেজ সাংবাদিকরা আপত্তি করবেন না।

এই কপিলদেবকে এক দিনের ক্রিকেটে দুনিয়ার এক নম্বর হিসাবে চিহ্নিত ও সম্মানিত করার জন্য নিশ্চয় বিশেষ স্বদেশপ্রেমের দরকার নেই। গাভাসকারের মতই কপিলও নিজের কীর্তি প্রচার করতে চান না। কিন্তু আমরা চাই, আমাদের ক্রিকেটনায়কদের সাফল্যে গর্বিত হতে, তাঁদের কীর্তির জয়গানে মুখর হতে। কপিলদেব সম্পর্কে সবচেয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক কথা এইটাই যে কীর্তির আরও উঁচু শিখরে পৌঁছবার সম্ভাবনা এখনও আছে। তিনি এখনও (লালা অমরনাথ মার্জনা করবেন), ক্রিকেট জীবনের মধ্যগগনে। এই সূর্যকিরণ এখনও বেশ কিছুদিন উদ্ভাসিত করবে ভারতীয় ক্রিকেটকে, মাঝেমাঝে মেঘ সে ত থাকেই, কী ক্রিকেটে, কী জীবনে



ছবি: বিকাশ সাধু

সুনীল এসেছিল বিশ্বকে বিস্মিত করে, যাবার সময়েও বিশ্ব বিস্মিত হক

পংকজ রায়

যা কিছু ভাল তাকে হারাতে কে চায়? আর সেই ভালটা যদি দুর্লভ হয় তাহলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সবাই, যতদিন না তার উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যতদিন না শেষ রসটুকু ঝরিয়ে সেই 'ভাল' ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছে।

সবকিছুকেই একটা না একটা সময়ে বিদায় জানাতে হবে। বিদায় জানানর সময়, যদি সবাই মিলে বলে এখন নয়, পরে, আরও পরে, তাতে যে বিদায় নিচ্ছে, তারও যেমন ভাল লাগে, তেমনি যারা বিদায় দিচ্ছে তাদেরও কাছে সে অমর হয়ে থাকে।

'আজকালে' হঠাৎ একদিন সকালে দেখলাম অস্ট্রেলিয়া সফরের পরেই গাভাসকার অবসর নিচ্ছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন না সবার আগে আমি ত একজন ভারতীয়। এত বড় একজন ব্যাটসম্যানের সাহায্য থেকে ভারতীয় দল বঞ্চিত হবে এটা কে চায়? বিশেষ করে এখনও যখন যে ব্যাট ধরলেই রান, সেঞ্চুরির রেকর্ডকে ক্রমশ অনতিক্রম্য করছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে এখন গাভাসকারের অবসর গ্রহণ করা উচিত কিনা। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আমি দ্বিধান্বিত। আমার ভেতর দুটো মনের তুমুল লড়াই চলছে। একদিকে, প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে যুক্তিবাদী মন, আর একদিকে একজন ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে, প্রাক্তন নির্বাচক হিসেবে আমার স্বার্থপর মন। স্বার্থ, মানে দেশের স্বার্থ।

ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থের কথা ভাবলে, বলব, সুনীল যতদিন সুস্থ শরীরে উইকেটে দাঁড়াতে পারবে, ততদিনই ওর খেলে যাওয়া উচিত। সুনীল যতদিন খেলবে, ততদিনই রান পাবে, আর ভারতীয় ক্রিকেটে আগামী তিন-চার বছরের জন্য অন্তত অপরিহার্য্য হয়ে থাকবে।

ক্রিকেটে টেকনিকালি নিখুঁত খেলোয়াড় বেশি আসে না। আর যারা আসে, তারা সহজে যাবার জন্য আসে না। যারা 'টাচ প্লেয়ার' তাদের খেলা দেখতে ভাল লাগে। দর্শকরাও তাদের সহজে নেয়। কিন্তু টাচ প্লেয়ারদের একটা মস্ত বড় অসুবিধা হল, একটু বয়স হলেই তারা অসুবিধায় পড়ে। 'মুভমেন্ট'-এ সময় লাগে ঝপ করে তাদের খেলা পড়ে যায়, দলের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বিশ্বনাথ।

কিন্তু সুনীলের ব্যাপারটাই অন্য রকম। হাজারে একটা পাওয়া যায়। ওর মত 'টেকনিকালি' নিখুঁত খেলোয়াড় যত বয়সই হক না কেন, কখনই দলের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। ব্যাট ধরলে কখনই এমন রান পাবে না, যা সমালোচনার রসদ যোগাবে। মাঝে মধ্যে দুএকটা ইনিংসের কথা আলাদা। সে ত ফর্মে থাকা কোন তরুণ খেলোয়াড়ও একটানা সব ইনিংসে রান পায় না।

সুনীলের মত টেকনিক্যাল নিখুঁত খেলোয়াড়দের পড়তে অনেক সময় লাগে। এ ব্যাপারে বিজয় হাজারের কথা মনে পড়ছে। যখন ও খেলা ছেড়েছে, তার অনেক আগেই হঠাৎ এক সময়ে কারুর কারুর মনে হয়েছিল ও বুঝি ফুরিয়ে গেছে।

ভারতে দক্ষ সূচনাকারী ব্যাটসম্যানের এখন বড় অভাব। সুনীল এই সময় অবসর নিলে ভারত খুবই অসুবিধায় পড়বে। দেশের স্বার্থে আর কিছুটা নিজের স্বার্থে সুনীলের অবসর গ্রহণ করা উচিত নয়।

'নিজের স্বার্থ' কথাটা বলায় কেউ কেউ আপত্তি তুলবেন। আসলে তারা এই কথাটাকে যেভাবে নিচ্ছেন, আমি সেভাবে বলতে চাই নি।

আমি আগেই বলেছি, সুনীল গাভাসকার আরও বছর চারেক খেলে যেতে পারবে। বিশেষ করে এখন যে রকম ফর্মে আছে সে কথা ভাবলে ত মনে হয়, চার বছর কেন, আরও বেশিদিন খেলে যেতে পারবে। আর একথাও আগে বলেছি, সুনীলের মত টেকনিক্যাল নিখুঁত খেলোয়াড়রা সহজে ফর্ম হারায় না। ফলে সুনীলের পক্ষে সর্বাধিক টেস্ট খেলা ও দশ হাজার রানের রেকর্ড করাও সম্ভব হত। আর ভারতীয় ক্রিকেটও আরও কিছুদিন ওর সেবায় পুষ্ট হবে। সুনীলকে যেটুকু দেখেছি, বুঝেছি, তাতে ত মনে হয়, দেশের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ এ দুটো ব্যাপারই সুনীলের মাথায় ভালভাবেই আছে। তবু সুনীল যদি অবসর নেয়, বুঝব এর পিছনে আছে কোন তীব্র অভিমানের জ্বালা। কেন এই অভিমান তা এখনই পরিষ্কার করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে একজন ক্রিকেটার হিসেবে বলব, সুনীলের অবসর নেওয়ার এটাই আদর্শ সময়। সুনীল এসেছিল সারা বিশ্বকে বিস্মিত করে, যাবার সময়েও সারা বিশ্ব আর একবার বিস্মিত হক। দুরন্ত সাফল্যের দিনেই সত্যিকারের প্রতিভাধরদের সরে যাওয়া উচিত।

অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তে কি সানির অটল থাকা উচিত?

'বোম্বাই থেকে/মৃণালকান্তি সাহা'

('রেকর্ড বুক ঠেললাম,
দরজা খুলে ভাবলাম,
চোখের পর্দা তুললাম,
আজকাল......পারি পার্শ্বিক
সবকিছু বড় ধড়িবাজ,
অন্ধকার, কমলালেবুর খোসা
ছুঁড়ে দৌড়।
হাতের গ্লাভস, পায়ের প্যাড,
খুলে রাখব স্কালক্যাপও,
নো মোর ন্যাস্টি ব্রোজ-------)'

●

১০ জানুয়ারি, ১৯৮৬। কলকাতার এডিটোরিয়াল ডেস্ক থেকে এল মর্মান্তিক আশঙ্কার খবর: আর একটিও টেস্ট ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মনোহরন গাভাসকার। সেই রাতেই, ঠিক সাড়ে তিনটেয় সিডনির পার্ক রয়্যালে টেলিফোনের ঝনঝন। সিডনিতে তখন ১১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে আটটা। সানি বললেন, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিতে পারেন অল্প দিনের মধ্যেই। ভাবছেন, একথা বলেওছেন ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় আসে নি। বললেন, মেলবোর্নে যেন যোগাযোগ করি। জানালাম, আমরা তাঁর কাছে চাইছি পাঁচ অঙ্কের টেস্ট রান। প্রবল হেসে সানি: "হোয়াই নট সিক্স ফিগার!" বললাম, আমরা সুযোগ চাই দেশের মাঠেই শেষ সংবর্ধনা জানাতে, স্ট্যান্ডিং ওভেশন। আবার হাসি, কিছুটা যেন বিষাদ মগ্ন। মনে হচ্ছে লিখিতভাবে কিছু না দিলেও মুখে নিজের ইচ্ছার কথা বোর্ডের দুই কর্তাকে জানিয়েছেন সানি। তাঁরা অনুরোধ করেছেন, সানি যেন অবসরের সিদ্ধান্ত অন্তত: একবছর মুলতুবি রাখে এবং কোনও অবস্থাতেই অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় কোনও ঘোষণা না করে। তাঁরা জানেন, দেশে ফিরলে নানাদিক থেকে চাপ আসবে, সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা কঠিন হলেও হতে পারে।

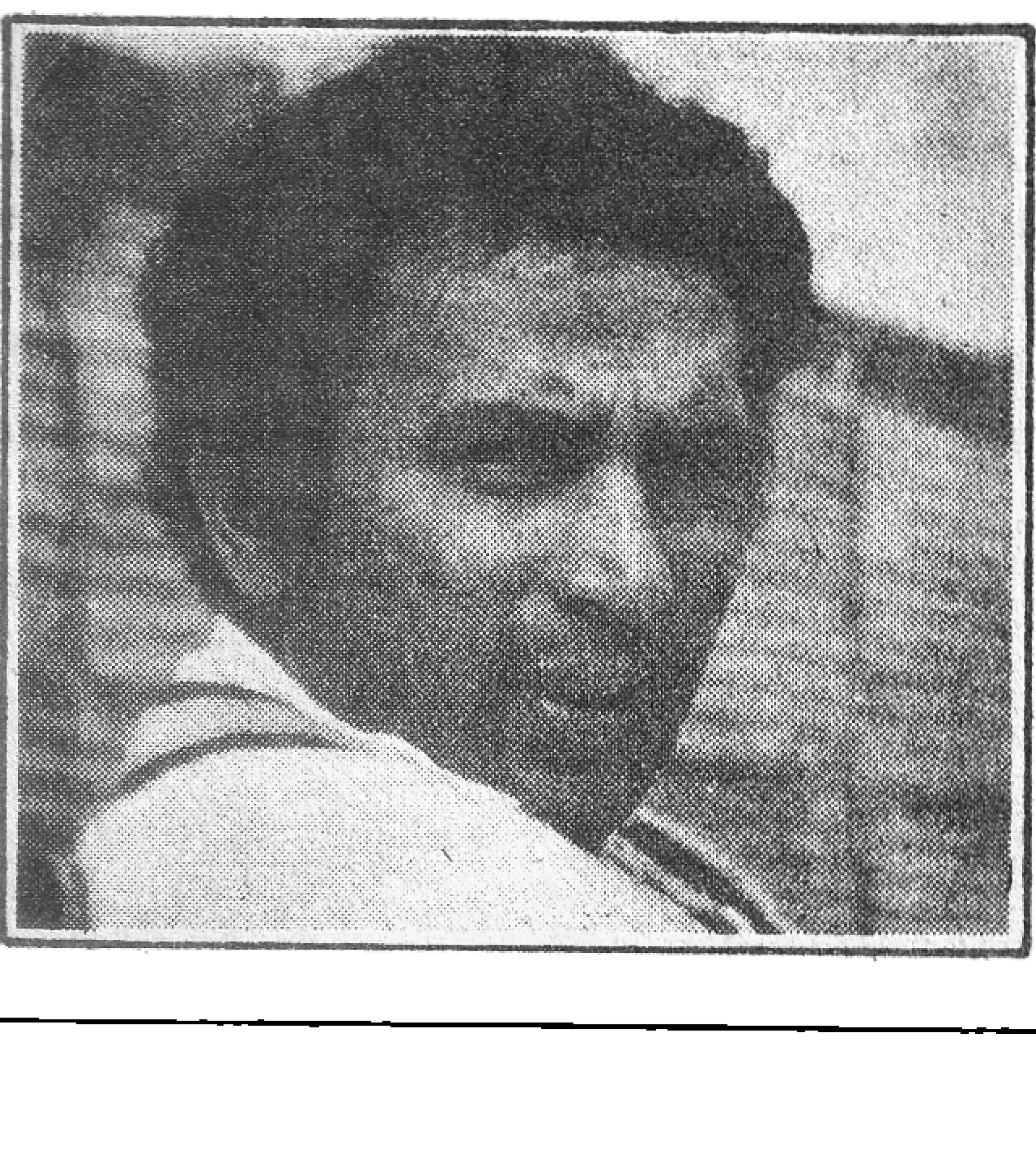
●

পঁচাশির ডায়েরী এখনও ফুরফুরে, তরতাজা, একটি পাতাও বিবর্ণ হয় নি। একুশে ফেব্রুয়ারির পাতা ওল্টালাম, মধ্যরাতে দরজায় করাঘাতের মত লেখা: "অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিজ কারেন্ট ওয়ান ডে চ্যাম্পিয়নশিপ ইন অস্ট্রেলিয়া, আই উইল স্টেপ ডাউন ফ্রম দ্য ক্যাপ্টেনসি। আই উইল কন্টিনিউটুবি অ্যাভেইলেবল অ্যাজ এ প্লেয়ার আন্ডার এনিবডি দ্য সিলেকসন কমিটি চুজেস অ্যাজ দ্য ক্যাপ্টেন"– সুনীল গাভাসকার। – প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এটি ছিল সুনীল জীবনের কঠিন মর্মদন্ত সিদ্ধান্ত। অহেতুক ঘা খেতে খেতে সানির ঘুম ছুটে গিয়েছিল, তার ওপর আবার উৎকট ভাবে এল অপ্রত্যাশিত ফোটো বিতর্ক। স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল সেদিনের নিন্দিত ঘটনাপ্রবাহ। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে ফোটোসেশন নিয়ে সেদিনকার পি টি আই ত্রিন্টের অ:সারবত্তা আজ আর কারও অজানা নেই। কলকাতা থেকে নির্দেশ পেলাম ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু সুনীল গাভাসকারকে ধরা চাই। সন্ধ্যে থেকে শুরু হল ম্যারাথন টেলিফোন প্রয়াস। প্রতিবারই রিসিভার তুলছিলেন বাসু পরাঞ্জপে 'মৃণাল, সুনীল নেই, ডিনারে গিয়েছে। ফিরতে রাত হবে।' তাঁকেই সব বলে রাখলাম, যাতে সানি ঘরে ঢোকা মাত্র সব জানতে পারেন। হাতে সময় খুব কম। রাত এগারটা পাঁচ-এ মার্শেনিল গাভাসকার রিসিভার তুলে বললেন, 'ইয়েস; জাস্ট আ মোমেন্ট, সুনীল ইজ কামিং। যেন অতি ক্ষিপ্রতায় উইশ করলেন সানি, তারপর বললেন, 'এসেই শুনলাম সবকিছু। কাগজ কলম নিয়ে রেডি হও, একটু ডিকটেশন নিতে হবে।' আন্দাজ করলাম, ফোটো বিতর্ক নিয়ে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু স্টেটমেন্ট নিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। সুনীল জানালেন, এটা আমি কাউকেই জানাইনি, তোমাকেই প্রথম বললাম। আজকেই কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।' আমার বিহ্বলতা বুঝে আরও বললেন, 'কাম অন মৃণাল, দিজ ইজ অলসো পার্ট অফ লাইফ। অ্যান্ড দিজ ইজ আ ফার্ম ডিসিশন।'

পরদিন শুধু আজকাল পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল এই ভয়ঙ্কর স্কুপ। বাকিটুকু ইতিহাস। বুঝলাম, আইফেলে নেমে এল ছায়া, প্রথম ছায়া, প্রচ্ছায়া। এ ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। আসবে উপচ্ছায়া। শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। রেকর্ড বুকের আইফেল টাওয়ার কি সত্যি অবসরের সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন? সুনীলের অবসরের সম্ভাবনা নিয়েও হাজার বিতর্ক। সত্যিই কি অবসর নিচ্ছেন? কবে ঘোষণা করবেন? ডেসপ্যাচ, কাউন্টার ডেসপ্যাচে দেশের দশ-কাগজ সরগরম। বোম্বাইয়ে কিছু ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। অবসর নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে এগচ্ছেন গাভাসকার, তা কি যুক্তি সংগত? নানা কণ্ঠে নানা সুর। আমি শুধু সংক্ষেপে সেগুলো তুলে ধরলাম।

মাধব মন্ত্রী: না, আমি এমন কোন খবর এখনও পাইনি। এখনই কোনও মন্তব্য করার সময় আসেনি। আগে ওর মুখে সব শুনি। রিটায়ার অবশ্য করতেই পারে। সব সম্মান পেয়ে গেছে, সব রেকর্ড ওর হাতে। এখন সরে গেলে বলার কিছু নেই।

সেলিম দুরানি: মাধব মন্ত্রী যা বলেছিলেন, তা পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। হ্যাঁ, অনেক রেকর্ড সুনীলের হাতে। ও আরও রেকর্ড করতে পারে, দশ হাজার টেস্ট রান ত হাতের মুঠোয়। কিন্তু, এই সব রেকর্ড-ফেকর্ড নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। সব রেকর্ড ভেঙে ফেললেই কি খেলা ছেড়ে দিতে হবে? নিজের জন্য নয়, দেশের কথা ভেবে সুনীলের ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া উচিত। দারুণ ফর্মে আছে সুনীল, ইন ফুল ব্লুম, দলের মনোবল তুঙ্গে রাখতে ওর উপস্থিতি অপরিহার্য। যদি ও অবসরের সিদ্ধান্ত নেয়, তা হবে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। সুনীল ভাবছে, কিন্তু এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। অনুরোধ করব, অন্তত: ইংল্যান্ড সফরে ও যেন যায়।



পলি উম্রিগড়: অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার প্রতিক্রিয়ার মূল্য এখানে নিতান্তই গৌন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, খেললে সুনীল এখনও বহু রান করবে। সেই রানগুলো ও করতে চায় কিনা, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

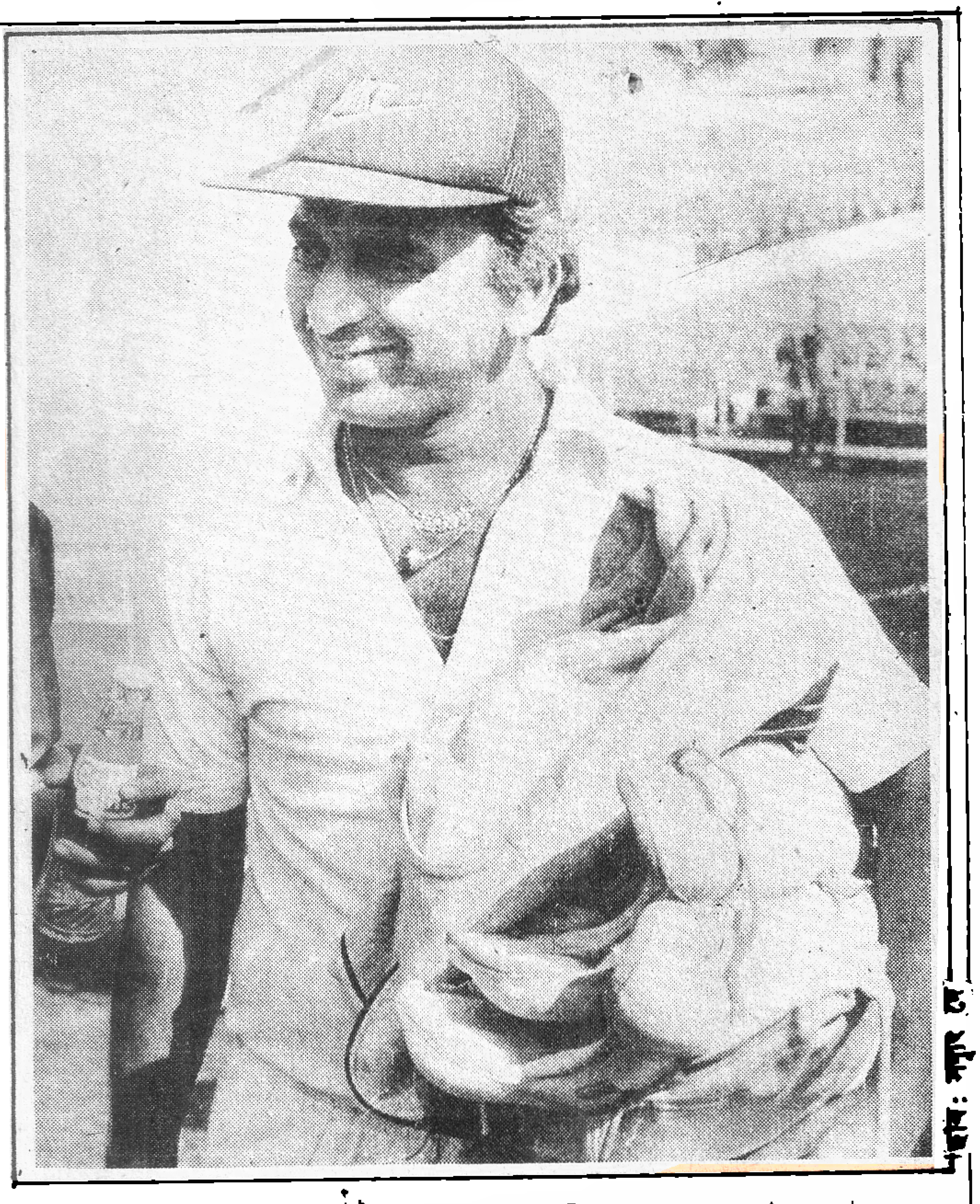
মিলিন্দ রেগে: সুনীল যদি এই সফরের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুবই আনন্দিত হব। তিন, টেস্টের সিরিজে দুটো সেঞ্চুরি করেছে; একশর ওপর অ্যাভারেজ, এটাই উপযুক্ত সময়। ও বরাবর বলেছে, ছিয়াশিতে ইংল্যান্ডে খেলে বিদায় নিতে চায়। কিন্তু অবসর গ্রহণের ব্যাপারটা কখনই পূর্ব-পরিকল্পিত হতে পারে না। সময়ের সন্ধিক্ষণে যদি কোন খেলোয়াড় অনুভব করে যে এটাই উপযুক্ত সময়, তখনই সে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়ায় সুনীল যদি সেই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে থাকে, সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। বন্ধু হিসাবে এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচ খেলার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতীয় দর্শকদের প্রত্যাশা বিরাট, হতাশার বহি:প্রকাশ আরও বিরাট, মানে ভয়ঙ্কর, শেষ টেস্টে সেঞ্চুরি করতে না পারলে হয়ত কমলালেবুর খোসাও পেতে হতে পারে।

বিজয় মার্চেন্ট: সুনীলের মত বিরাট ক্রিকেটারের এটাই অবসর নেওয়ার উপযুক্ত সময়। এভরি ওয়ান শুড আস্ক, 'হোয়াই', অ্যান্ড নট 'হোয়াই নট'।

পিলু রিপোর্টার (আম্পায়ার): কী বলছেন? তাহলে কী থাকবে আর ভারতীয় ক্রিকেটে? তাহলে ত মানেটা দাঁড়াচ্ছে, আর একটা টেস্টেও ওর সংগে মাঠে থাকার সুযোগ পাব না।

একনাথ সোলকার: কেউ বলছেন, সুনীলের অন্তত: দশ হাজার টেস্ট রান করা উচিত। কেউ বলছেন অন্তত: পঁয়ত্রিশটা সেঞ্চুরি। কেউ ভাবছেন ওর একশটা ক্যাচ ধরার কথা। আমি এসব কিছুই ভাবছি না বা চাইছি না। আমি চাই, আমাদের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার যতদিন পারে খেলে যাক, যত পারে রান তুলুক, যত পারে সেঞ্চুরি, যথাসম্ভব বেশি ক্যাচ। আমি চাই সুনীল ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করে যাক, যতদিন ওর পক্ষে তা করা সম্ভব।

সেঞ্চুরি, ব্র্যাডম্যান এবং সানি



গোপাল বসু

যে কোন মানের ক্রিকেটেই একজন ব্যাটসম্যানের প্রাথমিক কর্তব্য ও লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব রান সংগ্রহ করা। শুধু নিজের জন্যই নয়, দলের জন্যও। কিন্তু ‘যত বেশি সম্ভব রান’ একটি অর্থহীন কথা। এ থেকে নিশ্চিতভাবে কোন ‘সংখ্যা’ পাওয়া সম্ভব নয়। এতদ্দ্বারা যদি কিছু বোঝান হয়ে থাকে, সেটা হল শতরান, সাম্প্রতিককালে যাকে “টন” বলা হয়ে থাকে।

অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন, ‘টন’ শব্দটির সঙ্গে ক্রিকেটের সম্পর্ক কোথায়! এক টনের অর্থ এক হাজার কিলোগ্রাম অথবা দুই হাজার দুশ চল্লিশ পাউন্ড। এই শব্দটি, সুতরাং ভারি কিছুকে বোঝায়। ক্রিকেটে শতরানকেও এমনই ‘ওজন’ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। মানেটা এই যে, শতরান যাঁর ব্যাট থেকে আসছে, তাকে অনেকটা ভারি বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

কয়েকজন অবশ্য এমন কান্ড প্রায়শই ঘটিয়েছে। তাদের বিরল গোষ্ঠীর মানুষ হিসাবেই ধরে নেওয়া ভাল। এই নিবন্ধে সে ধরনের বিরল ক্ষমতাবান ক্রিকেটারদের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা যাক. যদি তাদের মধ্যে কোন সমান্তরাল রেখা টানা যায়। এ আলোচনা শুরু করার আগেই দুটি নাম আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে ফেলে – স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান এবং আমাদের সুনীল মনোহর গাভাসকার!

ব্র্যাডম্যানের জন্ম ছোট্ট শহর বাওরালে। অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এলাকা, অতএব ছোটবেলায় তাঁকে একা একাই খেলে যেতে হয়েছে বাড়ির পাশে একটি ট্যাঙ্কের নিচে। সরঞ্জাম বলতে একটি স্টাম্প (যা ব্যাট হিসাবেই ব্যবহৃত হত) এবং গলফের বল! ম্যাচ খেলার সুযোগ তিনি কদাচিৎ পেতেন, যখন তাঁর বাবা-কাকা-ভাইরা একসঙ্গে হতেন।

খুব ছোটবেলায় (বয়স তখন কতই বা হবে, বড়জোর দশ বছর) ব্র্যাডম্যান এমন একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাবার প্রতিশ্রুতি ছিল, শতরান করতে পারলে, ডন একটি ক্রিকেট ব্যাট পাবেন। ব্র্যাডম্যান কি তা পেয়েছিলেন? হ্যাঁ! বাবাকে গ্রাস করেছিল আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়, কারণ ডন সেদিন সামান্য কটা রান বেশিই করেছিলেন। তাঁর সংগ্রহ ছিল ৩০০। ব্র্যাডম্যান অবশ্য বিস্মিত হয়েছিলেন তিনটি ব্যাটের বদলে একটি ব্যাটই পেয়েছিলেন।

গাভাসকার প্রসঙ্গে আসা যাক। সে গল্প ত সবাই জানেন, যখন সুনীল শতরানপিছু বাবার কাছ থেকে দশ টাকা করে পেত। মনোহর গাভাসকারের মানিব্যাগ থেকে কত দশ টাকার নোট যে খসে গেছে!

অনেক কিশোর-তরুণ বলতে পারে, শতরানপিছু দশ টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত থাকলে, আমরাও তা করতে পারতাম! না, সত্যি নয় আমার বাবা আমাকে নিশ্চিন্তে একটি শতরানের জন্য একশ টাকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন (যদিও কখনও তিনি তেমন প্রতিশ্রুতি দেননি), এবং তিনি আদৌ গরিব হয়ে যেতেন না, কারণ ঐ বয়সে আমি কখনও সেঞ্চুরি করতে পারিনি। পরের দিকেও আমার ব্যাট কদাচিৎ সেঞ্চুরির মুখ দেখেছে।

কিন্তু ব্র্যাডম্যানের বাবা সেদিন যদি তিনটি ব্যাট দিতেন, মনোহর গাভাসকার যদি প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ দশ থেকে বাড়িয়ে একশ টাকা করতেন, তাঁদের অর্থভান্ডার থেকে নিশ্চয়ই কমে যেত বেশ কয়েক হাজার টাকা, যা সংসারের বাজেটের ওপর আঘাত করত। ছেলের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তাঁরা ভেবেচিন্তে এগিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ছেলের মধ্যে প্রতিভা নামক সাগরটির ঢেউ তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। ওঁরাই তাই ওদের শ্রেষ্ঠ কোচ ও অভিভাবক। আজও সমস্যায় পড়লে (প্রায়ই পড়ে!) সুনীল বাবার কাছেই ছুটে যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য। এই ছোট্ট তালিকায় আর একটি নাম সংযোজিত হতে পারে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল নায়ক পেলে। পেলে তাঁর বাবাকে আদর করে ডনড্রিনহো বলে ডাকতেন। এই মানুষটির উপদেশ তিনি শিরোধার্য করে নিয়েছেন তখনও, যখন বিশ্ব-ফুটবলের বিস্তৃত দিগন্তে তিনি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

অনেকেই বিস্মিত হতে পারেন, অধিকাংশ ভাল ব্যাটসম্যানই কেন সত্তর-আশির ঘরে আটকে থাকেন, নব্বই পেরতে গিয়ে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হন। নব্বই পেরলেও, একশর আগে থমকে যাওয়াটাও কি কিছুই অদ্ভুত মনে হয় না?

একশ ক্রিকেটে একটি জাদু-সংখ্যা, যেখানে পৌঁছনর জন্য প্রতিটি ব্যাটসম্যানই নিজের জীবনেরও কয়েকটি দিন কমিয়ে ফেলতে রাজি। নব্বই-এর ঘরে দাঁড়িয়ে তাই সে অনুভব করে তাকে ঘিরে থাকা পর্বতপ্রমাণ উত্তেজনা, প্রবল টেনশন। এই অবস্থায় সে শতরান নিয়েই বেশি ভাবতে থাকে, বলের প্রতি মনঃসংযোগ হারিয়ে যায়। ক্রিজে কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে থাকলেও, আতঙ্ক তৈরি হয়, টেনশন প্রায় সহ্যের সীমা ছাড়ায়, এবং শতরানে পৌঁছনর জন্য অযথা তাড়াহুড়ো করে সে ভুল শট নেয়, ডেকে আনে নিজেরই অনিবার্য পতন। সবচেয়ে বড় উদাহরণ: রোহন কানহাই ও আলভিন কালীচরণ।

আবার কিছু ব্যাটসম্যান রয়েছে, যারা পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে থাকতেই ভালবাসে। পঞ্চাশে পৌঁছেই তারা খুশি, সুতরাং এমন শট নিতে শুরু করে, যা তখন নেওয়া উচিত নয়। ওরা অল্পেই সন্তুষ্ট। প্রথম দিকে বিশ্বনাথের মানসিকতাও এমন ছিল, পরের দিকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতেই পঞ্চাশ থেকে সে শতরানে পৌঁছতে শুরু করল।

সুনীল গাভাসকারের টেস্ট জীবন

ব্যাটিং

টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	শত রান	অর্ধ শতরান	গড়	ক্যাচ
১১২	১৯৫	১৬	৯১১২	২৩৬*	৩২	৩৯	৫১.৩৫	৯৭

বোলিং

বল	মেডেন	রান দিয়েছেন	উইকেট	সেরা বোলিং	গড়
৩৫০	১৪	১৮৭	১	১/৩৪	১৮৭.০০

সুনীল গাভাসকারের বিশ্বরেকর্ড

সর্বাধিক শতরান (৩২), সর্বাধিক মোট রান (৯১১২), সর্বাধিকবার একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে শতরান ১২৪ ও ২২০ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পোর্ট অফ স্পেন, ১৯৭০-৭১। ১১১ ও ১৩৭ বনাম পাকিস্তান, করাচি, ১৯৭৮-৭৯। ১০৭ ও ১৮২ বনাম ওঃ ইন্ডিজ, **কলকাতা**, ১৯৭৮-৭৯।

একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসাবে দুবার পরপর তিনটি ইনিংসে শতরান করেছেন। ১১৭ অপরাজিত (ব্রিজটাউন), ১২৪ ও ২২০ (পোর্ট অফ স্পেন), ১১১ ও ১৩৭ (করাচি), ২০৫ (বোম্বাই) ১৯৭৮-৭৯।

একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি দ্বিশত রান করেছেন। **সর্বাধিক** উপর্যুপরি টেস্ট খেলেছেন ৯৭টি (পঞ্চম টেস্ট বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বোম্বাই, ১৯৭৪-৭৫ থেকে তৃতীয় টেস্টে বনাম অস্ট্রেলিয়া, সিডনি ১৯৮৫-৮৬)।

এক ক্যালেন্ডার বছরে চারবার হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ১৯৭৬ (১০২৪ রান, ১১টি টেস্ট), ১৯৭৮ (১০৪৪ রান, ৯টি টেস্ট), ১৯৭৯ (১৫৫৫ রান, ১৮টি টেস্ট), ১৯৮৩ (১০৭৪ রান, ১৭টি টেস্ট)।

সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ে হাজার রান – ৭৮ দিন, ছটি টেস্ট, ১৯৭৮-৭৯ মরসুমের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফৈজলাবাদে প্রথম টেস্ট খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট কলকাতায়।

টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ইনিংস (১৯৫) খেলেছেন।

টেস্ট জীবনের প্রথম সিরিজেই সর্বাধিক রান ৭৭৪ বনাম ওঃ ইন্ডিজ, ১৯৭০-৭১। এটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে একটি সিরিজে সর্বাধিক রানও বটে।

তার আগে কিন্তু চলে গেছে অনেকগুলি টেস্ট, নষ্ট হয়ে গেছে বেশ কিছু শতরানের সম্ভাবনা।

আর একজনকে মনে পড়ছে – নর্মান ও'নীল। তাঁর মাথার ওপর সবসময় খাঁড়ার মত ঝুলেছে 'দ্বিতীয় ব্র্যাডম্যান'-এর আখ্যাটি। ও'নীল নিঃসন্দেহে অসাধারণ ব্যাটসম্যান, কিন্তু এই মানসিক চাপটাই সহ্য করতে পারেন নি। অনুরাগীরা সবসময়ই সেঞ্চুরি চাইতেন। তিনি নিজে কিন্তু পঞ্চাশেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই তাঁকে নির্ধারিত সময়ের আগেই অবসর নিতে হয়।

এই দুই শ্রেণীর ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে আলোচনায় বোঝা যায়, ইনিংসের কোন এক মুহূর্তে তারা মানসিক চাপের শিকার হয়ে, তা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় মনে করে।

ব্র্যাডম্যান ও গাভাসকার প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা ক্রিকেটের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

এমন অভাবনীয় সাফল্যের কারণ কী? এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ব্র্যাডম্যান একবার বলেছিলেন, 'কোন বোলার আমার উইকেট নিতে পারে, এই চিন্তাকে আমি মনে প্রশ্রয় দিই না। দ্বিতীয়, প্রত্যেকটা বলকেই আমি ইনিংসের প্রথম বল হিসাবে বিচার করি।'

বক্তব্যের প্রথমাংশ থেকে একটা ব্যাপারই পরিষ্কার হয় আত্মবিশ্বাস, প্রতিভাবানদের মধ্যে যা থাকাটা স্বাভাবিক। বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশ একটা জিনিসই বোঝায় – নিশ্ছিদ্র মনঃসংযোগ।

প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই জানে, প্রথম বলটাতেই মনঃসংযোগ সবচেয়ে গভীর থাকে, ইনিংস এগনর সঙ্গে সঙ্গেই তা চিঁড় খায়, কমতে থাকে। ব্র্যাডম্যান এখানেই সবার থেকে আলাদা। ইনিংস শুরু করার সময় তিনি যতটা মনোনিবেশ করতেন, তিনশ রানে পৌঁছনর পরও তাই। এটাই প্রমাণ করে, মানসিক চাপ তাঁকে কখনও গ্রাস করতে পারত না। চার পাশে যা ঘটছে, তা থেকে নিজের মনকে তিনি ভারমুক্ত রাখতে জানতেন। শুধু ব্যাট করে যাওয়া এবং রান পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি অবিচল থাকতেন।

ব্র্যাডম্যানের **দর্শন যদি এমন হয়,** সুনীলের দর্শন হয়ত অন্যরকম শোনাবে, ব্যাপারটা কিন্তু আসলে একইরকম। গাভাসকার কখনও স্কোর বোর্ডের দিকে তাকায় না। আতঙ্ক কখন হয়? যখন কেউ ষাট বা নব্বই-এ থাকে। আমরা ভেবে নিতে পারি, তারা যদি গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে উদাসীন থাকে, শান্ত ও সংযত থাকতে পারবে, ভাল খেলতে পারবে।

সুনীল নিজের রান না জেনে, নিজের অজান্তেই মানসিক চাপকে দূরে সরিয়ে দেয়, যাবতীয় মনঃসংযোগ বিস্ময়করভাবে ধরে রাখে

সুনীলের এই ব্যাপারটার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ: যখন সে দিল্লিতে মার্শালকে ড্রাইভ করে মিড উইকেটে বাউন্ডারি-তে পাঠিয়ে নিজের ঊনত্রিশতম শতরানে পৌঁছেছিল, বেঙ্গসরকার ছুটে এসে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিল, 'ইউ হ্যাভ ডান ইট।' সুনীলের শূন্য দৃষ্টির সঙ্গে জিজ্ঞাসা ছিল: 'ডান হোয়াট?" বেঙ্গসরকার ব্যাপারটা বলার পর বিস্মিত সুনীল স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়েছিল।

এই আলোচনায় আমি আর একজনকে টেনে আনতে চাই। টেনিসের মহানায়ক বিয়র্ন বর্গ। সে অবসর নিয়েছে। কিন্তু ভিডিও সেটে তার খেলা ধরা থাকলে, একবার তার দিকে তাকান, ডাউন-দ্য-লাইন বা ক্রসকোর্ট নেওয়ার সময় তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। যেখানে গোটা স্টেডিয়াম ফেটে পড়ছে, বর্গ শান্তভাবে হেটে যাচ্ছে, দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ পায়ের নিচের ঘাসের ওপর। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গই বিজয়ী) তার আনন্দ ও আবেগ কিছুটা বোঝা যেত। এ যেন মহাভারতের সেই অর্জুন, যাঁর দৃষ্টিতে পাখির চোখের মণি ছাড়া আর কিছুই আসত না।

যারা বড়, তাদের নিজেদের খেলা বিশ্লেষণ করে তা উন্নত করে নেওয়ার অদ্ভূত ক্ষমতা থাকে। এটাই কারণ, সব বড়কেই একটু নিঃসঙ্গ কাটাতে হয়। তারা এটাই পছন্দ করে। এ য়মের কোন ব্যতিক্রম নেই।

ব্র্যাডম্যান নিঃসন্দেহে ভীষণ নিঃসঙ্গ থাকতেন। সহখেলোয়াড়রা শুধু ম্যাচের কয়েক ঘণ্টাই তাঁর দেখা পেতেন। সুনীল এতটা না হলেও, গত কয়েক বছরে নিজেকে অনেকটা নিঃসঙ্গ করে নিয়েছে।

গোটা ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? শতরানের সাফল্যের ঝরণায় স্নাত হতে গেলে যা দরকার – (১) অসাধারণ দক্ষতা, (২) কাজের প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা।

আর একটু সহজ করে বলা যাক: নিজের ক্ষমতা নিংড়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করা। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নয়। ব্যাপারটা সহজ, কাজটা কিন্তু তা নয়।

সানির সেই বত্রিশটি

ক্রমিক	রান	বিপক্ষ	স্থান
১	১১৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	জর্জ টাউন
২	১১৭*	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	ব্রিজ টাউন
৩	১২৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	পোর্ট অফ স্পেন
৪	২২০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	পোর্ট অফ স্পেন
৫	১০১	ইংল্যান্ড,	ম্যাঞ্চেস্টার
৬	১১৬	নিউজিল্যান্ড,	অকল্যান্ড
৭	১৫৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	পোর্ট অফ স্পেন
৮	১০২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	পোর্ট অফ স্পেন
৯	১১৯	নিউজিল্যান্ড,	বোম্বাই
১০	১০৮	ইংল্যান্ড,	বোম্বাই
১১	১১৩	অস্ট্রেলিয়া,	ব্রিসবেন
১২	১২৭	অস্ট্রেলিয়া,	পার্থ
১৩	১১৮	অস্ট্রেলিয়া,	মেলবোর্ন
১৪	১১১	পাকিস্তান,	করাচি
১৫	১৩৭	পাকিস্তান,	করাচি
১৬	২০৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	বোম্বাই
১৭	১০৭	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কলকাতা
১৮	১৮২*	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কলকাতা
১৯	১২০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	দিল্লি
২০	২২১	ইংল্যান্ড,	ওভাল
২১	১১৫	অস্ট্রেলিয়া,	দিল্লি
২২	১২৩	অস্ট্রেলিয়া,	বোম্বাই
২৩	১৬৬	পাকিস্তান,	মাদ্রাজ
২৪	১৭২	ইংল্যান্ড,	বাঙ্গালোর
২৫	১৫৫	শ্রীলংকা,	মাদ্রাজ
২৬	১২৭*	পাকিস্তান	ফৈজলাবাদ
২৭	১৪৭*	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	জর্জটাউন
২৮	১০৩*	পাকিস্তান,	বাঙ্গালোর
২৯	১২১	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	দিল্লি
৩০	২৩৬*	ওয়েস্ট ইন্ডিজ,	মাদ্রাজ
৩১	১৬৬*	অস্ট্রেলিয়া,	মেলবোর্ন
৩২	১৭২	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি





ছবি: জহর রায়

একত্রিশ বত্রিশ

মৃণালকান্তি সাহা

ওঁরা আইডলস, ওঁরা স্বপ্নের মণিদীপ। ওরা একত্রিশ, বত্রিশ, সেঞ্চুরি একত্রিশ, সেঞ্চুরি বত্রিশ। দীর্ঘ খরার পর শীতল বারি সিঞ্চন। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে ঐতিহাসিক দ্বিশতাধিক। এরপর দীর্ঘ যতিচিহ্ন। দীর্ঘতর হা-হুতাশ। সক্রিয় হলেন দর্শক-মনোরঞ্জন পদ্মভূষণ সুনীল গাভাসকার। এডিলেড-ওভালে উইলো-পেশী আবার প্রকাশিত, আবার শত পুষ্প বিকশিত। আবার সিডনীতে। 'ভারত-ডনে'র একত্রিশ ও বত্রিশতম টেস্ট সেঞ্চুরি।

নতুন কী বিশেষণ পাওয়া যাবে তাঁর জন্য? আবেগ সমুদ্রমন্থনে সব বিশেষণ নিঃশেষ ত সেই উনত্রিশ-ত্রিশেই! 'চলন্তিকা'র পাতা ওল্টালাম, না, আলো নেই কোনও। অ্যাংলো-বেংগলি মার্কা কিছু শব্দ নিয়েও নাড়াচাড়া করা গেল, সবই নিস্ফল। শেষ পর্যন্ত বিশেষণ লাগালেন অজিত লক্ষ্মণ ওয়াদেকার: 'বিক্রমাদিত্য সানি!' সম্ভবতঃ বিখ্যাত মাদ্রাজ টেস্টের পর থেকেই অনেক বিশেষণ নিয়ে শ্যাডো প্র্যাকটিস করেছেন ওয়াদেকার। মাথায় এলেও ব্যবহার করার সুযোগ পান নি। এডিলেড-সিডনী এনে দিল সেই মুহূর্ত।

হ্যাঁ, নষ্টচন্দ্রের দশা কেটে গেছে। সানির খরতাপে ফের হিল্লোলিত চতুর্দিক। ইচ্ছা করছে, এই মুহূর্তে লেসলি কেউইজ সম্পাদিত 'দি পোয়েট্রি অফ ক্রিকেট' থেকে সানি-সম্পর্কিত কবিতাটি আপনাদের শোনাতে। কিন্তু সুদীর্ঘ ইংরেজি কবিতা থাক। এইরকম:

'হিজ রানস, দে ফ্লোড ফ্রম
মাইন্ড অ্যান্ড ব্যাট,
হিজ কনসেনট্রেশন সুপ্রীম।
হি হ্যাড নো টাইম ফর লিটল চ্যাট,
হি স্ট্রোভ টু অ্যাচিভ আ ড্রিম।'

ত্রিশতম শতরানের পর পূর্ণেন্দু পত্রীরই মত গাভাসকার-অনুরাগী এই কবির কবিতাটি নিঃসন্দেহে স্তুতি-মূলক। কিন্তু স্তুতির মান রেখেছেন গাভাসকার, এডিলেডে আর সিডনী-তে। এডিলেডে পাঁচশ একান্ন মিনিটে চারশ ষোল বলে অপরাজিত একশ ছেষট্টি। সুন্দররাজন লিখলেন তাঁর ডেসপ্যাচে 'খেলা বন্ধ হবার এক ঘণ্টা আগেও গাভাসকার ক্রিজে ছিলেন এবং সংগীর অভাব না হলে সম্ভবত আরও কটা দিন ত সহজেই – সম্ভবতঃ চালিয়ে যেতে পারতেন।' দুঃখের কথা, ডনের শহরে এই শতরানের সময় মাঠে ছিলেন না এক হাজার দর্শকও, ছিলেন না স্বয়ং ডন ব্র্যাডম্যান। (ডনের সংগে সানির অবশ্য দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, সানি নাকি ডনের সব কথাই তুলে নিয়েছেন তাঁর নোটবুকে)। কিন্তু এডিলেডে প্রেস বক্সে ছিলেন বিল 'টাইগার' ওরিলি। হাতের দুটো তালু মুড়ে যেন কাল্পনিক বায়নাকুলার বানিয়ে নিরীক্ষণ করেন 'লিটল মাস্টার'কে। তারপর মুখর হন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। লেখেন, 'এইরকম নিখুঁত ব্যাটসম্যান-দেরই ক্রিকেটের দেবতা পছন্দ করে এসেছেন চিরকাল, যাঁরা ক্রিকেট জীবনের শেষ দিকেও থেকে যায় সমান স্বচ্ছন্দ। এরা রান পাবেই, অধিকাংশ সময়। এবং যেমন তেমন করে তোলা রান নয়, কেতাদুরস্ত সব রান, যা বোলারকে শাসন করে, এবং দর্শকদের দেয় অনাবিল আনন্দ।

চতুর্থ দিনের শেষে চুরানব্বইয়ে অপরাজিত ছিলেন সানি, কিন্তু জানতেন না। স্কোর বোর্ডের দিকে তাকান না কখনও, ভেবেছিলেন আশির কোঠায় আছেন। সাজঘরে ঢোকার মুখে বললেন এক শুভানুধ্যায়ী:



ছবি: জহর রায়

'আর মাত্র একটা সিঙ্গলস দরকার ছিল!' সানি বিস্মিত, মাত্র ছয় বাকি? সাংবাদিকরা আসন্ন একত্রিশ সম্পর্কে মন্তব্য চাইলেন। সানি বললেন, 'আগে করি!' পরদিন অপরাজিত একশ ছেষট্টির পর বললেন, 'আজ ভোরে ঘুম ভাঙার পর হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে, ওই ছ'টা রান বোধহয় আর করা হল না। হ্যাঁ, ভাল লাগছে বেশ। যে দু বছরে একটা সেঞ্চুরি করে, সে সেঞ্চুরি পেয়ে খুশি হবেনা?'

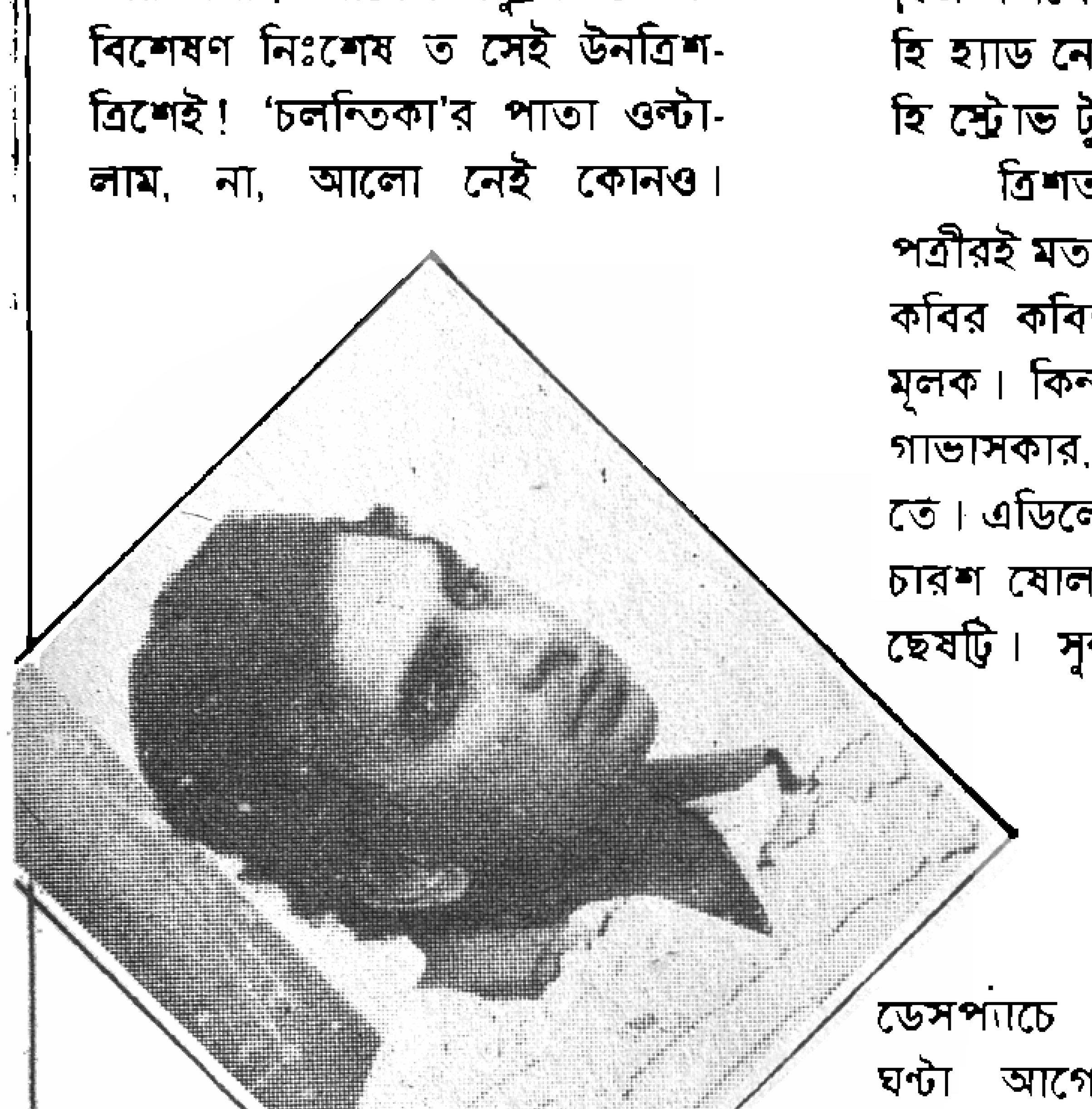
যশস্বী সুনীল গাভাসকারের রানমেশিন চালু হওয়ায় উৎফুল্ল ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীরা, যাদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন (হিসেবটা সটকার-সম্পাদক সন্দীপ পাটিলের) গাভাসকারের ভক্ত। বোম্বাইয়ের ক্রিকেট মহলে শোনা যাচ্ছে নতুন আবদার: এখন খেলা ছাড়া চলবে না, পাঁচ অঙ্কের টেস্ট রান চাই, সেঞ্চুরি চাই পঁয়ত্রিশ!

সিডনীর শতরান যেন রান-বন্যার পর পলিমাটির মত, সেই উর্বর জমিতে ফলবে না কেন আরও সেঞ্চুরির সোনালী ফসল? কিথ স্ট্যাকপোল: 'গাভাসকারকে দেখে আর মুগ্ধ হই না, যেন ওইরকমই হবার কথা। একজন প্রথানুযায়ী ওপেনার, যে মিড্‌ল অর্ডারেও সমান সাবলীল। সিরিজে তিন টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি করলে যে কোন ব্যাটসম্যানই খুশিতে ডগমগ হবে, কিন্তু গাভাসকার তেমন খুশি হতেই পারে না, কারণ ও গাভাসকার।'

সিডনীতে দ্বিতীয় দিন একশ বাহাত্তরে আউট হন সানি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় রেকর্ড (১৯৮১, এডিলেডে, সন্দীপ পাটিলের ১৭৪) থেকে দু রান পিছিয়ে। লাঞ্চ-এর আগের দু ঘণ্টায় মেঘলা আকাশ আর জবরদস্ত বোলিংয়ের বিরুদ্ধে করেন ছত্রিশ, তাঁর চেয়ে বেশি বল খেলে অমরনাথ করেন আঠার। তবু, সমালোচিত বেশি হন সানিই, কেন পিটিয়ে খেললেন না? ডাবল সেঞ্চুরির লোভে? তাহলে লেগ স্পিনে ঝুঁকি নিয়ে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হলেন কেন? কেন উত্তর দেবেনা!

উত্তরের এক ক্রিকেটার সিডনী থেকে কলকাতায় তাঁর নিকটাত্মীয়কে টেলিফোনে খবর দেন: এখানে সানির আস্তে খেলার সমালোচনা হচ্ছে! সব শুনে দিলীপ সরদেশাই বললেন, "ওই অবস্থায়, টীমের রান পাঁচশ পার হবার পরেও দুঘণ্টারও বেশি সময় খেলে দিলীপ করল সাঁইত্রিশ, কে কিছু বলল না কেন? সকালের ভারি আবহাওয়ার ঝামেলাটা চুকিয়ে দেবার পর সুনীল হাত খুলছিল, ও আউট হওয়ার পর আরও দ্রুত রান অন্যরা তুলল না কেন? কপিল রান তুলেছে দু মিনিটে এক রান – এই হারে। ওই অবস্থায়, আরও আক্রমণাত্মক নয় কেন? সুনীল ডাবল সেঞ্চুরির কথা ভেবেছে, এটা অবশ্যই হতে পারে। তাতে অন্যায় কী হল? মহিন্দার সেঞ্চুরির কথা ভাবেনি? আর বলুন ত, সুনীল কি ক্রিজে কখনও ঘুমিয়ে ছিল?'

চার্চ গেটের সিমেন্ট হাউসে দেখা করতে গিয়েছিলাম এ সি সি-র



ছবি: জহর রায়

একজিকিউটিভ বাপু নাদকার্নির সঙ্গে। বাপু বললেন: 'বত্রিশটা সেঞ্চুরি, ভাবা যায় না ভাই! তবু, সেরা মনে হয় দিল্লির ওই একশ একুশ, উনত্রিশ নম্বর। এখনও জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। চৌত্রিশ বছর বয়সে মার্শাল-হোল্ডিং-ডেভিস-ড্যানিয়েলের তোপের মুখে দাঁড়িয়ে ওপেনার হিসাবে সেঞ্চুরি করা মুখের কথা নাকি? আর কী সেঞ্চুরি! এডিলেড আর সিডনীর দুটো সেঞ্চুরি, আমার মনে হয়, নির্বাচকমণ্ডলীর দুই গালে দুটি চপেটাঘাত। আমি মনে করি, আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারের আন্তরিক অনুরোধ নির্বাচকদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল। তিরাশিতে সুনীলের বদলে কপিলকে অধিনায়ক করেও নির্বাচক-রা বড় ভুল করেছিল। সেই ভুলের বোঝা এখনও বহন করতে হচ্ছে প্রতিভাবান কপিলকে। ওর আত্ম-



বিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছিল এই ভুল সিদ্ধান্ত। আহত হয়েছিল সুনীলও। তখন নয়, আজ সুনীলের পর কপিলকে অধিনায়ক করা হলেই ভাল হত না কি? কপিল সহ-অধিনায়ক হিসাবে শিখে নিতে পারত আরও অনেক কিছু। কোনরকম রেষারেষির মধ্যে না গিয়ে। আসলে, উদ্দেশ্য ত সেই সুনীলকে আঘাত করা! ওরা সুনীলকে ওপেন করার জন্য জোর করতে পারে, রবিকে বলতে পারল না? অথবা, রাজপুতকে ওপেনার হিসাবে নিয়ে মিডল অর্ডারে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চাইতে পারল না?'

'বিক্রমাদিত্য সানি' প্রসঙ্গে এসে অজিত ওয়াদেকারও আবেগে অদ্ভুত: 'চারদিকে কত কথা, কত চক্রান্ত, সুনীল তবু সহজে রান করার কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে। টেস্ট সেঞ্চুরির এবং টেস্ট রানের – দুটির একটি রেকর্ডও কেউ কখনও সুনীলের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে বলে মনে হয় না। হয়ত দূর ভবিষ্যতে পারবে কেউ, আমি ভাবতেও পারছি না। মানছি, যখন রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম চোখের সামনে নিজের টীমে খেলতে দেখলাম, কল্পনা করতে পারিনি ছেলেটা একদিন এভাবে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে যাবে। ভাবতে অবাক লাগে, আজকের এই বিশ্ববিজয়ী খেলোয়াড়টিই রঞ্জি ট্রফিতে আমাকে প্যাড খুলতে সাহায্য করত, ক্লান্ত হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলে কখনও কখনও বুটও খুলে দিত। একবার আমার ব্যাট ফেটে গেল খেলার সময়। প্যাভিলিয়ন থেকে ছুটে এসে নিজের ব্যাট আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গিয়েছিল, 'আমার ব্যাটেই তোমার সেঞ্চুরিটা হক!' আমি তাড়াতাড়ি আউট হলে বলত, 'ক্যাপ্টেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেলে, এখন আমরা কী করে পাঁচশ রান তুলব?' হ্যাঁ, ও প্রায় সব সময়ই পাঁচশ টার্গেটের কথা ভাবত। এবং, সিনিয়রদের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা ছিল ছেলেটার। এজন্যই হয়ত এত বড় হতে পেরেছে সুনীল, এরকমই ভাবতে ভাল লাগে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আমরা রওনা হবার আগে চীফ সিলেক্টর বিজয় মার্চেন্ট বললেন, 'ওই ছেলেটা সবচেয়ে বেশি রান করে ফিরবে!' কোন ছেলেটা? যে ছেলেটা সেই প্রথম টীমে এল – সুনীল গাভাসকার। মার্চেন্টের মত বিশ্বাস আমার ছিল না, মানে, অতখানি ছিল না। বড় হবে জানতাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি অত বড় – ভাবিনি। যাওয়ার পথে নিউইয়র্কে ওর আঙুলে অপারেশন করতে হল, প্রথম টেস্ট খেলতে পারল না, কেঁদেও ফেলেছিল। সেই ছেলে আজ আঃ ভাবতে ভাল লাগে। ও যখন এখনও এক দণ্ডও চিন্তা না করে লিখে দেয় যে ওর সেরা অধিনায়কের নাম অজিত ওয়াদেকার – গর্বে বুক ভরে ওঠে। ওপেন করুক, অথবা আসুক তিন চার পাঁচ ছয় – যে কোনও জায়গায়, রান পাওয়া ওর কাছে আদৌ সমস্যা নয়।'

প্রসঙ্গ তুলে আনলেন ওয়াদে-কার স্বয়ং, স্বভাবতই গাভাসকারের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন করলাম। তাঁর অভিমত: 'সুনীল চার-পাঁচ নম্বরে খেলতে চাইছিল। চাওয়ার অধিকার আছে ওর, হয়ত অনায়াসেই রান পেত সেখানে। কিন্তু সুনীল



মিডল অর্ডারে যাওয়ার পর দেখা গেল, প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানরা আস্থা নিয়ে খেলছে না, খেলতে পারছে না, তাড়াতাড়ি প্যাভিলিয়নের ছায়ায় ফিরে আসছে। এখন, টীমের জন্য ওকে আবার ওপেন করতে হচ্ছে। নির্বাচকদের ওপর রাগ করে সুনীল শারজা-অস্ট্রেলিয়ায় না গেলে অন্তত আমি সমালোচনা করতাম। সুনীল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওপেনার, হ্যাঁ, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওপেনার, ওর কি নিচে আসা মানায়? আমি ওকে ক্রিকেট জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক নম্বরেই দেখতে চাই, ব্যাটিং অর্ডার এবং ব্যাটিং ফর্ম – দুদিক দিয়েই।' তারপর একটু থেমে শেষ করলেন অজিত লক্ষ্মণ ওয়াদেকার: 'সুনীল কেন মিডল অর্ডারে না হলে খেলব না – বলছিল? কোন্ যুক্তিতে? আসলে কী জানেন, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যারা অনন্য ব্যতিক্রম, তাদের মধ্যে এক ধরনের একরোখা খেয়াল থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখা যায় এরকম আশ্চর্য খেয়ালিপনা। আমরা, সাধারণ মানুষরা এই খেয়ালিপনার অন্য অর্থ খুঁজি। সুনীল অসাধারণ – ওকে সাধারণ নিক্তিতে বিচার না করাই ভাল। বাহাত্তর কোটি মানুষের দেশে এই একজনই সুনীল গাভাস-কার। দুনিয়াতেও ওই একজনই। ওর কাছে আমাদের ঋণ শোধ হবার নয়।'

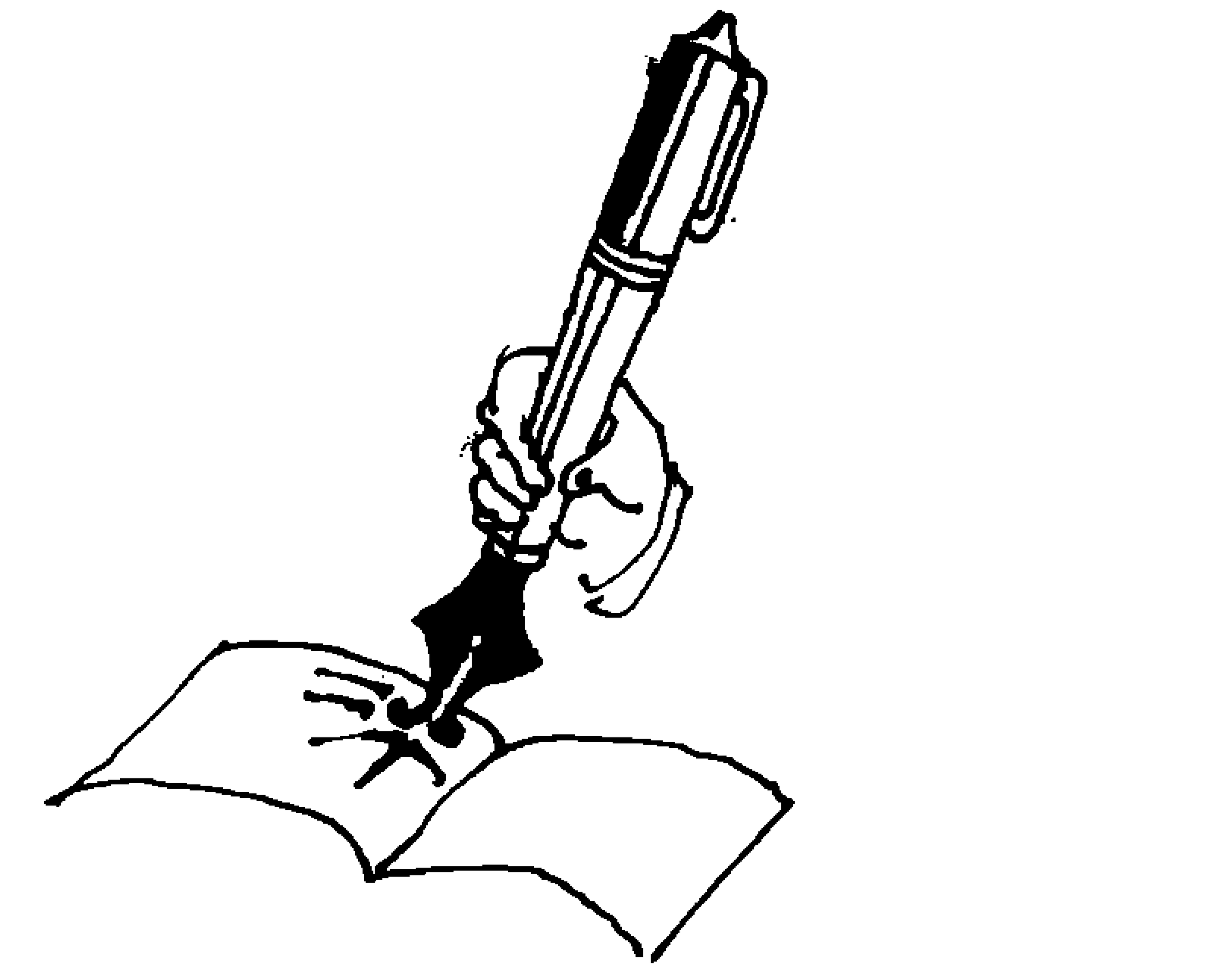
শেষ কথা বোধহয় বলেছেন একনাথ সোলকার: 'বত্রিশটা সেঞ্চুরি! মশাই, এমন করতে পারলে আমি কাউকে পাত্তাই দিতাম না, আপনারা কেউই দিতেন না। সুনীল পরিচিত-



দের সঙ্গে এখনও আগের সুনীলের মতই কথা বলে। দেখুন, ওর কাছে আমার কোন স্বার্থের ব্যাপার নেই। তবু বলছি, সুনীল মহৎ। গ্রেট ক্রিকেটার, গ্রেট ম্যান।

●

হে মহান সানি বিরোধীগণ



ধীমান দত্ত

হে মহান সানি বিরোধীগণ, আপনারা এ অধমকে মার্জনা করিবেন। আপনাদিগের এই ঘোর দুঃসময়ে কোথায় দুঃখে কাতর হইব, তাহা না করিয়া অকস্মাৎ এই পত্রের খোঁচায় বিব্রত করিতেছি। বিশ্বাস করুন, কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জনেই আপনাদিগের অমর কীর্তির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের স্বভাবটাই খারাপ কিনা, যতবার সে চেষ্টা করিলাম, প্রতিবারই গোটা শরীর কেমন যেন গুলাইয়া উঠিল, একটি সশব্দ অট্টহাসকে শত চেষ্টাতেও শাসন মানাইতে পারিলাম না। আপনারা অনেক মহৎ, উদার। আমার এই অমার্জনীয় অপরাধকে মৃদুহাস্যে ক্ষমা ও উপেক্ষা করিবার মহত্ব ও ঔদার্যটুকু আপনারা না দেখাইলে, আর কে দেখাইবে?

আবার বলি, এ ঘোর দুঃসময়। ঐ যে ছোট্টখাট দেখিতে বদমাসটি, সুনীল গাভাসকার না কী যেন নাম, টেস্টে নয় হাজার না কত যেন রান করিয়াছেন, বত্রিশটি সেঞ্চুরি, আরও যেন কী-কী সব রেকর্ড-ফেকর্ড করিয়া ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্তর ক্ষতি এবং সর্বনাশ ঘটাইয়াছেন, তিনি, হঠাৎ ভারতীয় ক্রিকেট এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরিয়া যাইতে চাহিতেছেন। এমনিতে ব্যাপারটা মন্দ নয়, কতদিন তাঁকে তাড়ানর কত চেষ্টাই ত আপনারা করিয়া আসিয়াছেন। আহা, দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু লোকটির কী প্রচন্ড সাহস, বিতাড়িত হইবার আগেই নিজ হইতেই বিদায় লইতে চাহিতেছেন, সদর্পেও শির উঁচু রাখিয়াই। ইহা আসলে আপনাদিগকে বিপদে ফেলিবারই চালমাত্র। আমরা কি কিছুই বুঝি না? 'চারিপার্শ্বে কিছু গন্ডমূর্খ হঠাৎ যে কেন 'যাইও না-যাইও না' করিয়া হাহুতাশ আর চিৎকার করিয়া মরিতেছে, কে জানে!

কিন্তু একটিই মুশকিল হইয়াছে। একটু চুপিচুপি ফিসফিস স্বরেই কহিতেছি, কেহ শুনিয়া ফেলিতে পারেন, আপনারা যে তাহলে একেবারে বেকার হইয়া যাইবেন। সুদীর্ঘ চোদ্দ পনের বছর ধরিয়া কোনপানে না তাকাইয়া নিরলস চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রমে একটি মহান কার্য নিখুঁতভাবে সমাধা করিয়াছেন।

সানিকে (লোকটি হাড়বজ্জাত হইলে কী হইবে, নামটি ভারি সুন্দর!) অভিযোগ, সমালোচনা ও কটূক্তিতে জর্জরিত করিয়াছেন, রাজ সিংহাসন থেকে তাঁহাকে বারংবার টানিয়া নামাইতে চাহিয়াছেন পথের ধূলায়, শুধু চটিজুতা, কমলালেবুর খোসা বা নোংরা আবর্জনাই নয়, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন অপমান ও লাঞ্ছনার তীব্র জ্বালাময় তীর, ভারতীয় দল হইতে তাঁহাকে নির্দ্বিধায় ছাঁটিয়া ফেলিবার সুপ্রস্তাব দিয়াছেন; তাঁহার রত্নখচিত কীর্তির সমাধিস্থলে পুষ্প নহে, কর্দম ছিটাইয়াছেন, আরও কত কী করিয়া তাঁহার মান সম্মান লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া ভারতীয় ক্রিকেটের যে পরম সেবা করিয়াছেন, তাঁহার প্রভূত উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, ইতিহাস তাহাকে চিরকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখিবে। কত জনে কত কী কহিয়াছেন, সমালোচনা ত আপনাদেরও শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে না দমিয়া ছিদ্রান্বেষণের অদ্ভূত ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন। বড় কিছু, মহৎ কিছু করিতে যাইলে এত অল্পে হতোদ্যম হইলে চলে না, আপনারা জানিতেন। রান করিতে করিতে সেঞ্চুরি করিতে করিতে কদাচিৎ সানিও হয়ত ক্লান্ত হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের ক্লান্তি বলিয়া কিছুই নাই। কলমের কালি অফুরন্ত, তাহা কখনই নিঃশেষিত হইবার নয়, উর্বর মস্তিষ্ক প্রতি মুহূর্তেই জন্ম দিয়াছে উদ্ভট বিচিত্র কল্পনার, নিশ্চয়ই আরও দিবে। সানি যদি সত্যই অবসর গ্রহণ করেন, তাহার পিছনে আপনাদিগের অবদান অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহার? আপনারা তুলনাহীন, সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব। পরবর্তী প্রজন্মকে আপনারা এই শিক্ষায় দীক্ষিত করুন।

হে মহামান্য সানি-বিরোধী সাংবাদিককূল, আপনারা কতই না অভিযোগ খাড়া করিয়াছেন এই ছোট্ট মানুষটির বিপক্ষে। সানি দলের মধ্যে রাজনীতি আনিয়াছেন। তিনি পরশ্রীকাতর, অনেককেই পছন্দ করেন না। আজহারউদ্দিন পরপর সেঞ্চুরি করিতে শুরু করায়, নিজের রেকর্ড ভঙ্গ হইবার আশঙ্কাতেই তিনি নাকি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ইনিংসে তাঁহার অর্ধশতরান পূর্ণ হইতেই ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আজহার তৃতীয় টেস্টে শতরান করার পর সবাই তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে ড্রেসিং রুমের বাহিরে আসিলেও সানি আসেন নাই, ইহা আপনারা ড্রেসিংরুমের সম্পূর্ণ উল্টোদিকে প্রেস বক্সে বসিয়াও আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, সামান্য দূরবীনের সাহায্যেই, গোটা ব্যাপারটা যাচাই করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। আপনারা সযত্নে ভুলিয়া যান, তরুণ আজহারের সর্বাধিক প্রশংসা যাঁহার কাছ হইতে আসিয়াছিল, তাঁহার নাম সানি গাভাসকার। আপনারা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, সানি নিজের জন্যই খেলেন, দলের জন্য নহে। তিনি অত্যধিক রেকর্ড সচেতন। ঠিকই ত, না হইলে কালীচরণের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেনে দ্বিশত রান হইতে মাত্র আঠার রান দূরে দাঁড়াইয়া কেন ইনিংস ছাড়িবেন? ফ্লেচারের ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে ইডেনে দ্বিতীয় ইনিংসে ইচ্ছা করিলেই শতরান পূর্ণ করিতে পারিতেন, সানি তবু ৮৩-তেই থামিয়া রহিলেন, বাকি ১৭-র ঝুঁকি না লইয়া। সে ত নিজেরই জন্য!

আপনাদিগের অভিযোগের ত শেষ নাই। সানি ত তরুণ খেলোয়াড়দের সাহায্য করেন না। তিনি ইগো সমস্যায় ভোগেন। গোপাল বসু নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন: সানি তাঁহাকে প্রচুর প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়াছেন। অরুণলাল ডাঁহা মিথ্যাবাদী, না হইলে কী করিয়া কহিলেন যে, সানির সঙ্গে ব্যাট করিবার সময় কখনই সানি বুঝিতে দেন না যে, অনাজন 'ইনফেরিয়ার'। এসব মিথ্যায় প্রভাবিত না হইবার জন্য ধন্যবাদ। যিনি বিশ্বনাথ হইতে শুরু করিয়া অন্য অনেককেই নিজ হইতে উৎকৃষ্ট ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরশ্রীকাতর। এ বিনয় শুধু ভান্ডামিরই অভিনয় – আপনারা ঠিকই ধরিয়াছেন।

আপনারা কত জানেন! সানির নেতৃত্বে কপিল নিজেকে উজাড় করিয়া দিলেও, কপিলের অধিনায়কত্বে তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য সানি যে কেবল ডুবাইয়াছেন, এখবর আপনারা সরবরাহ না করিলে, আমরা কোথা হইতে জানিতাম? সানি ত কপিলকে দেখিতেই পারেন না, তাঁহাকে দল হইতে বাদও দিয়াছিলেন! যিনি বা যাঁহারাই এই গল্পটি চালু করিয়া থাকুন, তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই। বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নয়, সানির কণ্ঠে কপিল সম্পর্কে যে প্রসংসাবাণী

বারবার ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাও নিছক অভিনয়, মুখোশ। বেদিকে বাদ দিবার পিছনেও ত সেই সানিই, কী বলেন? 'আইডলস্'-এ কপিল ও বেদিকে স্থান দেওয়া – ইহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কপিলকে 'দি মোস্ট ন্যাচারাল ক্রিকেটার' এবং বিষাণকে তাঁহার দেখা সেরা বাঁহাতি স্পিনার বলা – সানির চালাকি আমরা বুঝি হে বাপু।

আর শুধু বেদি বা কপিলই কেন, আপনারা কত কষ্ট করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিলেন সেই গল্প – সানি দিলীপ দোশিকে দেখিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে বেশি বল না দিয়া প্রিয় শিষ্য রবি শাস্ত্রীকে তুলিতেছেন। অর্থাৎ নিজ নেতৃত্বে সেরা অস্ত্রকেও অকেজো করিবার ঝুঁকি তিনি লইয়াছিলেন। দোশি বাদও পড়িলেন ত সানিরই জন্য। তিনি টীমে ঢুকিয়াছিলেন কাহার জন্য? এ প্রশ্ন তুলিবে কোন মূর্খ? রবি শাস্ত্রী পরবর্তী সময়ে কতটা উঠিয়াছেন, আমরা জানি। সানি তাঁহাকে কোন সাহসে ভারতের ভবিষ্যত অধিনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিলেন? আর, এই নির্বাচকগুলিও ত আচ্ছা আহাম্মক, এখন ত দেখিতেছি, তাহাই ঘটিতে চলিয়াছে। সানিরই কারসাজি ইহা।

আপনারা ইহাতেই থামেন নাই। জীবনে কে কতদূর ক্রিকেট খেলিয়াছেন, জানা নাই, কিন্তু ব্যাটসম্যান সানির সমালোচনায় আপনাদের কোন দ্বিধা ছিল, অতি বড় শত্রুও এমন কথা বলিতে পারিবেন না। সানি যথেষ্ট মারিয়া খেলিতে পারেন না, একদিনের ক্রিকেটে ত অচল। তিনি তীব্র পেস-এর বিরুদ্ধে খেলেন নাই। মানে, সাফল্য পান নাই। উদাহরণ? সেও আপনারা দিয়াছেন: ডেনিস লিলি। তিনি ম্যাচ জিতান ইনিংস খেলিলেন কোথায়? বিপদে বুক চিতিয়ে দাঁড়াইতে পারেন না, রান পান শুধু ভাল পিচে। মনে পড়িতেছে দক্ষিণ ভারতের সেই সাংবাদিকের কথা, যিনি কহিয়াছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং জুটি নাকি গাভাসকার ও ঘোটসকার। ঘোটসকারের দয়ায় সানি আউট হইয়াও বহুবার বাঁচিয়াছেন।

তা ওভালে সানির সেই ২২১ নিশ্চয়ই ঠুক ঠুক করিয়া তোলা। একদিনে ১৭৯ রান করিয়াছিলেন। ২৭৯ করিতে পারিলেন না কেন? কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে বোম্বাই এ একদিনে ১৭৪ করিয়াছিলেন। কিছুই নহে। ভিভ রিচার্ডসকে দেখিয়াছেন? সানি ভক্তরা বলিবেন, জীবনে খারাপ সময় সবারই যায়, সেই সময়েই লিলির সংগে দেখা হওয়ায় সানি সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি ত হোল্ডিং-মার্শাল-টমসন রবার্টসদের অবহেলায় খেলিয়াছেন। যত্তোসব! তাছাড়া বিপক্ষ দলে ভাল বোলার থাকিল কিনা, সত্যিই প্রকৃত ফাস্ট বোলার থাকিল কিনা, সেটি সানিই কেন ঠিক করিয়া দিলেন না? তাহা হইলেই ত ব্যাপারটা চুকিয়া যাইত। আসলে সেই ক্ষেত্রে বাছাধন মজা টের পাইত। বিপদে লড়াই, ম্যাচ জিতান ইনিংস খেলা, ভারতকে টেস্ট জয় উপহার দেওয়া এমন কিছু নজিরও সানি ভক্তরা তুলিয়া ধরিবেন। বারিশ! আমরা মানিব না, কিছুতেই মানিব না। সেঞ্চুরি? সে ত ঘোটসকারের দয়ায়? কী বলিলেন, সানির বিদেশেই বেশি সেঞ্চুরি রহিয়াছে? ওখানে ঘোটসকার কোথায়? দূর, দূর, খবর নিন, ওখানেও কোন এক ঘোটসকারকে পাকড়াও করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই। কিছুই খবর না রাখিয়া কেন যে কেহ কেহ সানির হইয়া ওকালতি করেন, বুঝি না।

ইমরান খানের মতে সানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওপেনার। ভুল নিশ্চয়ই। ভিভ রিচার্ডস সানির গুণমুগ্ধ। তিনি কিছুই জানেন না। স্যার গ্যারি সানিকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন, স্যার ডন তাঁহাকে 'ক্রিকেটের অলঙ্কার' আখ্যা দিয়াছেন ত কী হইয়াছে? আপনারা মানেন নাই যে; সানি অত বড় ব্যাটসম্যান। বেশ কয়েকবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন, সানি জীবনের শেষ টেস্ট খেলিলেন। ঠিকই করিয়াছেন। ৩৬৫ রান করিয়াছেন আর কী কী যেন করিয়াছেন গ্যারি। ডন ত ব্যাটিংয়ের প্রবাদপুরুষ। দুজনেই স্যার উপাধি পাইয়াছেন ত কি মাথা কিনিয়া লইয়াছেন নাকি? যাহা বলিবেন, তাহাই শুনিতে হইবে? আপনাদিগের সম্মিলিত ক্রিকেটবুদ্ধির কাছে ওঁরা দাঁড়াইতেই পারিবেন না। ওঁদের কথায় তাই গুরুত্ব দেন নাই আপনারা বড় কাজ করিতে যাইলে, এমন আলতু-ফালতু লোকের কথায় কান দেওয়া যায় না।

সানি আনস্পোর্টিং! তবু কেন যে অনেকেই কহেন, তিনি আউট হইয়া উইকেটে দাঁড়ান না! সানি অর্থলোলুপ। না হইলে লয়েডের দলের বিরুদ্ধে ইডেনে 0 ও ২0 করার পর বিরতি দিবসে রূপার দোকানে গিয়া বই-এ সই করেন? খবরের কাগজে পাশাপাশিই ত ছবি ছাপাইয়াছিলেন আপনারা লয়েড অন্ধদের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। বিরতি দিবসে আসলে সানির উচিত ছিল, পিচে গিয়া ব্যাট করা। আইন নাই? ঠিক আছে, তাহলে লয়েডের মত কিছু ত করিতে পারিতেন। সানিভক্তরা তৎক্ষণাৎ কিচিরমিচির লাফাইয়া ছিলেন, সানি নাকি আর্তের সেবায় বহুবার নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন, নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াও। হয় মিথ্যা কথা, নাহয় সেখানেও সানির কোন স্বার্থ ছিল, ষড়যন্ত্র ছিল।

আসলে আপনারা প্রত্যেকেই অবহিত, সানি ঘোর অর্থপিশাচ। সেই কারণেই রূপার দোকানে গিয়াছিলেন? অথচ দেখুন, আপনারা কি মহান, একেবারে অর্থচিন্তা করেন না। কেউই করেন না, শুধু সানি করেন। বিশ্রাম লওয়ার ইচ্ছায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে না গিয়া, সটান কাউন্টি ক্রিকেট খেলিতে গেলেন কীসের জন্য? সেই ত অর্থ। স্বয়ং টাইগার পতৌদি কহিয়াছেন। কিন্তু তিনিই আবার ভুল করিয়া কেন যে সানির ব্যাটিং-এর প্রশংসা করিয়া বসিলেন! আপনারা সুকৌশলে রটাইয়াছিলেন, সানি পড়তির দিকে। পতৌদি দুম করিয়া বলিলেন যে, তিনি এত উঁচুতে উঠিয়াছেন, পড়িতেও বিস্তর সময় লাগিয়া যাইবে। টাইগারের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির ত এমন ভুল হওয়ার কথা নয়।

আপনারা সানিকে জঘন্য অধিনায়ক কহিয়াছেন। রক্ষণাত্মক, নেতিবাচক। হ্যাঁ, পতৌদিও কহিয়াছেন, কেহ কেহ আবার সানিকে ভারতের নিকৃষ্ট অধিনায়ক 'আখ্যা' দিয়াছেন। এই টনি গ্রেগ, ইয়ান চ্যাপেল, রিচি বেনোরা কেন যে তাঁহার অধিনায়কত্ব লইয়া এত নাচানাচি করিলেন, বুঝিলাম না। এমন ক্রিকেটমূর্খ হইয়া ওঁরা কী করিয়া জীবনে সফল হইয়াছিলেন? ইয়ান চ্যাপেল আবার বলেন কিনা, সানি ভারতীয় ক্রিকেটের একমাত্র ফাদার-ফিগার। ওয়েস হলও দেখিতেছি মহামূর্খ। আপনাদিগকে সংগ্রামী অভিনন্দন, এত কিছুতেই লজ্জিত হন নাই। আরে মুনি-ঋষিরাই ত কহিয়া গিয়াছেন, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়। লজ্জা ত নারীর ভূষণ, সে কি আপনাদিগের মত স্বঘোষিত বীরদের মানায়?

হে মহামান্য দর্শকবৃন্দ, পাল্লা দিয়া ছুটিয়াছেন আপনারাও। দিল্লিতে আপনারাই ত চেঁচাইয়াছিলেন, 'সানি তেরে পিছে মার্শাল আ রহা হ্যায়'। কলকাতায় তাঁহাকেই শুধু নয়, তাঁহার স্ত্রীর দিকেও আবর্জনা – লেবু-কলা ছুঁড়িয়া মারিয়া অপমান করিয়াছিলেন। হুঃ; সানি গাভাসকার ত শিশু, তিনি কী বুঝিবেন আপনাদের ক্ষমতা? তিতিবিরক্ত করিয়া আপনারা তাঁহাকে দিয়া ঘোষণা করাইয়াছেন, কলকাতায় আর খেলিব না। পথে এস বাবা। পুলিসপ্রহরায় সানি বাসে উঠিতেছেন, আহা ছবিখানি বাঁধাইয়া রাখিবার মত। এতখানি সম্মান তাঁহাকে আর কাহারা দিয়াছেন?

এবং নির্বাচককূল! পাকিস্তান সফরে বিধ্বংসী ইমরানের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের পর সানিকে আপনারা অধিনায়ক পদ থেকে খারিজ করিলেন। আপনাদের সময়জ্ঞানের তুলনা নাই। এ বিপর্যয়ের জন্য সানির অধিনায়কত্ব কতটা দায়ী এসব ভাবিতে গেলে, ভবিষ্যতে কোপ মারার আর সুযোগ পাওয়া যাইবে না। দীর্ঘদিন বিপক্ষের গোলাগুলি সামলাইয়া সানি জীবনের শেষদিকে মিডল অর্ডারে ব্যাট করিতে চাহিয়াছিলেন। আবদার আর কি! তাঁহাকে ওপেন করিতে বাধ্য করিয়া আপনারা নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করিয়াছেন, তাঁহার অপমানের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়াছেন।

যে মানুষটি পনের বছর ধরিয়া পরম মমতায় গড়িয়াছেন ভারতীয় ক্রিকেটের ইমারৎ, তাঁহাকে ক্রমাগত অপমান করিয়া যাওয়ার অপরিসীম ক্ষমতা আপনারা দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার কত চক্রান্তই করিয়াছেন, কত কাহিনী আর গল্প রচিয়াছেন। কিন্তু শুরুতে যাহা কহিতেছিলাম, এবার যে আপনারা বেকার হইয়া পড়িলেন। সানি গাভাসকারের বিদায়ের পর কোথায় পাইবেন অমন দুরন্ত টার্গেট? অতঃপর কী করিবেন? অপেক্ষা? সে ধৈর্যের পরীক্ষাতেও আপনারা সফল। সানির সুসময়ে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষায় থাকিয়াছেন, তাহার দুঃসময়ে হাজার শয়তানী লইয়া হাজির হইবার জন্য। সুতরাং অপেক্ষায় থাকুন, আর একটি সানি গাভাসকারের জন্য। এই সানি বিদায় লইলে, ভারতীয় ক্রিকেট হইতেও বিদায় লইবে যাবতীয় খারাপ জিনিসগুলি। ভারতীয় ক্রিকেট নিশ্চয়ই আগাইবে অভাবনীয় প্রগতির পথে। যদি তাহারই মাঝে আবার উদিত হয় সানির মত আর কেহ, আপনারা ত থাকিলেনই যথোপযুক্ত পরিমাণে থুতু, নোংরা, কাদা ও কালি ছিটানর জন্য, অপমানের তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া ভারতীয় ক্রিকেটকে বাঁচাইবার জন্য। আমার বিশ্বাস, সে দায়িত্ব পালনে আপনারা ভুল করিবেন না। ইতিহাস আপনাদিগকে মনে রাখিবে, তার কালো পৃষ্ঠায় আপনাদিগের স্থান দিয়া। জয় আপনাদের অনিবার্য। হৃদয়ের একরাশ আন্তরিক ধিক্কার ও অকৃত্রিম ঘৃণাসহ

ইতি

এক অতি সামান্য [illegible]

পঞ্চম নেহরু গোল্ড কাপে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, ব্যাপক ঘরোয়া কোন্দল ঃ ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিদ্রুপ ও ধিক্কার

রাশিয়ার দাপটে ভারতীয় ফুটবলের আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব তীব্র হল

ত্রিবান্দ্রাম থেকে সরোজ চক্রবর্তী

ত্রিবান্দ্রাম আদৌ ফুটবলের শহর নয়। সতের জানুয়ারির আগে পঞ্চম নেহরু গোল্ড কাপের ব্যাপারে এ [illegible]কার মানুষদের আগ্রহ নেহাৎই কম ছিল। বিদেশী টীমগুলো আসতে যখন দেরি করছিল, তখন ত রটে গেল টুর্নামেন্ট হবে না। ষোল এবং সতের তারিখ শহরে পা রাখল টীম, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পেরু ও পূর্ব জার্মানি । সরকারি উদ্যোগে টুর্নামেন্ট চলছে বলে এখানে অনেকেরই ক্ষোভ। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের গা-ছাড়া ভাব। মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ যে-সব কর্মকর্তারা, তাঁদের দাপটের কাছে অন্যরা কোনঠাসা।

দলাদলি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অনেকেই চাইছে, যদি কোন কারণে টুর্নামেন্ট বানচাল হয়ে যায় তাহলে মজাটা জমে উঠবে। রাজ্য সরকারি তরফ থেকে সিজিন টিকিট পুলিস মারফৎ শহরের বাইরেই বেশি বিক্রি করা হয়েছে, যাঁদের অনেকে শুধুমাত্র মন্ত্রী ও পুলিসকে খুশি করতেই দামী সিজিন টিকিট কিনেছেন। আর্থিক ক্ষতির কথা কর্মকর্তাদের ভাবতে হচ্ছে না– আছে গৌরি সেন!

ঘরোয়া কোন্দল এমন পর্যায়ে যে, কেউ কেউ কার্ড ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছেন। নতুন চন্দ্রশেখরন নায়ার স্টেডিয়ামে পঁয়ত্রিশ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন। কিন্তু ভারত-রাশিয়া ম্যাচে পঁচিশ হাজারের বেশি দর্শক আসেন নি। স্টেডিয়ামের কাজও পুরোপুরি শেষ হয় নি। কোন রকমে ড্রেসিংরুম তৈরি করা হয়েছে, যা দেখে বিদেশী টীমগুলো বিস্মিত!

এখানে প্র্যাকটিস মাঠ নিয়েও সমস্যা। যে মাঠে টুর্নামেন্ট চলছে, রাশিয়াকে সেখানে প্রথম দিন সকালে প্র্যাকটিস করতে বাধা দেয় সংগঠকরা। শেষ পর্যন্ত অশোক ঘোষের চেষ্টায় রাশিয়া প্র্যাকটিস করে। ১৮ জানুয়ারি সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে গিয়ে ভারতীয় টীম দেখে পূর্ব জার্মান প্র্যাকটিস করছে। পি কে-র টীম অপেক্ষা করে এক ঘণ্টা। সংগঠকদের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ ছিল না। এগারটা নাগাদ পেরু সেই মাঠে হাজির হয়ে, পূর্ব জার্মানির প্র্যাকটিস শেষ হওয়ার পর ভারতকে সুযোগ না দিয়ে প্র্যাকটিসে নেমে পড়ে।

রাশিয়ার কাছে ছয় গোল খাওয়া ভারতীয়রা অসহায় হয়ে ফিরে যায় মেডিক্যাল কলেজ মাঠে, যে মাঠ আদৌ প্র্যাকটিস করার উপযুক্ত নয়। কোচিনে চতুর্থ নেহরু কাপের ব্যবস্থাপনা ভাল ছিল। ত্রিবান্দ্রাম চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। অশোক ঘোষ ২০ তারিখ পর্যন্ত ছিলেন, তাই অনেক সমস্যা তিনি একা সমাল দিয়ে গেছেন। রাজনৈতিক দলাদলিও টুর্নামেন্টে প্রভাব ফেলেছে।

কালিকট ফুটবল সংস্থার কর্মকর্তারা একদিনবললেন ত্রিবান্দ্রামে ফুটবল নিয়ে কোন হই চই নেই। রাজ্য সরকার যদি কালিকটের স্টেডিয়ামটা তৈরি করে দিত তাহলে সেখানে নেহরু গোল্ড কাপ করা যেত। অহেতুক এখানে স্টেডিয়াম তৈরি করে এত টাকা নষ্ট করল। পঞ্চম নেহরু কাপকে ঘিরে ক্রমশ অভিযোগের, ক্ষোভের পাহাড় জমছে।

এই অবস্থায় উদ্বোধনী দিনে ভারত ছয় গোলে হেরে দর্শকদের উৎসাহ আরও কমিয়ে দিল। খুব

রাশিয়া ম্যাচের পর অশোক ঘোষ বলছেন

'ছয় গোলে হারলেও ইন্ডিয়াকে মারদেকায় পাঠাব'

ভারত-রাশিয়া ম্যাচের আগেরদিন মাসকট হোটেলে নিজের রুমে বসে এ আই এফ এফ সচিব অশোক ঘোষ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "ইন্ডিয়া টীমে যে-সব ইয়ং ছেলে এসেছে, তারা পা বাঁচিয়ে খেলে না। জান লড়িয়ে খেলে, দেশের জন্য চিন্তা করে। এই ধরনের প্লেয়ার দরকার। ওরা যা খেলছে, পরে সেই জায়গায় ঢুকতে স্টার প্লেয়ারদের লড়তে হবে।"

– "তরুণ-অলোক-সুদীপ-বিশ্বজিৎ-বিকাশ-কৃশানুদেরও কি টীমে সুযোগ পেতে লড়তে হবে?"

– "তরুণ, অলোক, সুদীপ ও কৃশানু সহজে টীমে ঢুকে যাবে। কিন্তু বিকাশ ও বিশ্বজিৎদের লড়তে হবে।"

দিল্লি ও বাঙ্গালোরে বোখুমের সঙ্গে এ আই এফ এফ একাদশ দারুণ লড়ার পর কর্মকর্তাদের এমন ধারণা হয়ে গেল সরফ আলি, বেণী-মস্তান, সত্যেন, আমজাদ ও জো ডি সিলভারা ভারতকে অনেক সাফল্য এনে দেবে। আসল সময়ে, রাশিয়ার সঙ্গে নেহরু গোল্ড কাপের প্রথম ম্যাচেই বেণী-মস্তানদের খোলসটা খুলে গেল। সেই ঘুরে ফিরে তরুণ, অলোক, সুদীপ, বিকাশ, বিশ্বজিৎ ও কৃশানুদের প্রয়োজনটা দেখা দিচ্ছে।

ছয় গোল খাওয়ার পর চন্দ্রশেখরণ নায়ার স্টেডিয়ামে ভি আই পি আসনে নির্বাক হয়ে ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বসে ছিলেন। ম্যাচের পর রাতে অশোক ঘোষ পঙ্কজ হোটেলে পি কে-কে টেলিফোন করে বললেন, "তুই চিন্তা করিস না। প্লেয়ারদের স্পিরিট দেখে আমারা খুশি। ছয় গোল খাওয়ার মত ম্যাচ তোর টীম খেলে নি। অতনু একা তিনটে বাজে গোল খেয়েছে। দু-তিন গোলে হারলে এত সমালোচনা হত না। যাইহক, নেহরু গোল্ড কাপ জেতার স্বপ্ন ত আমাদের ছিল না। আমাদের টার্গেট কামিং এশিয়াড।'

পরের দিন অশোক ঘোষ বললেন, "রাশিয়া অনেক বেটার সাইড। আমাদের টীম তবুও যা খেলেছে তাতেই দুটো গোল হতে পারত। অতনু যদি ভুল না করত তাহলে রেজাল্ট হত ৪-২ গোল। কে কী বলছেন জানি না। আমরা কিন্তু হতাশ নই। এই ছেলেরাই এশিয়াডে ভাল খেলবে। ছয় গোল খেলেও ইন্ডিয়াকে মারদেকায় পাঠাব। ওখানে এশিয়ান কান্ট্রিগুলো আসবে। আমাদের শক্তি ওখানে বোঝা যাবে।"

এবারের টীম নিয়েই কর্মকর্তাদের এত আশা জেগেছিল যে, টুর্নামেন্টের আগে ঘোষণা করা হয়, ম্যাচ জিতলে ফুটবলাররা মাথাপিছু দেড় হাজার এবং ড্র করলে পাবে পাঁচশ করে টাকা। অশোক ঘোষ একা আশাবাদী থাকলেও অন্যান্য কর্মকর্তারা ভারতীয় টীম সম্পর্কে বেশ হতাশ।

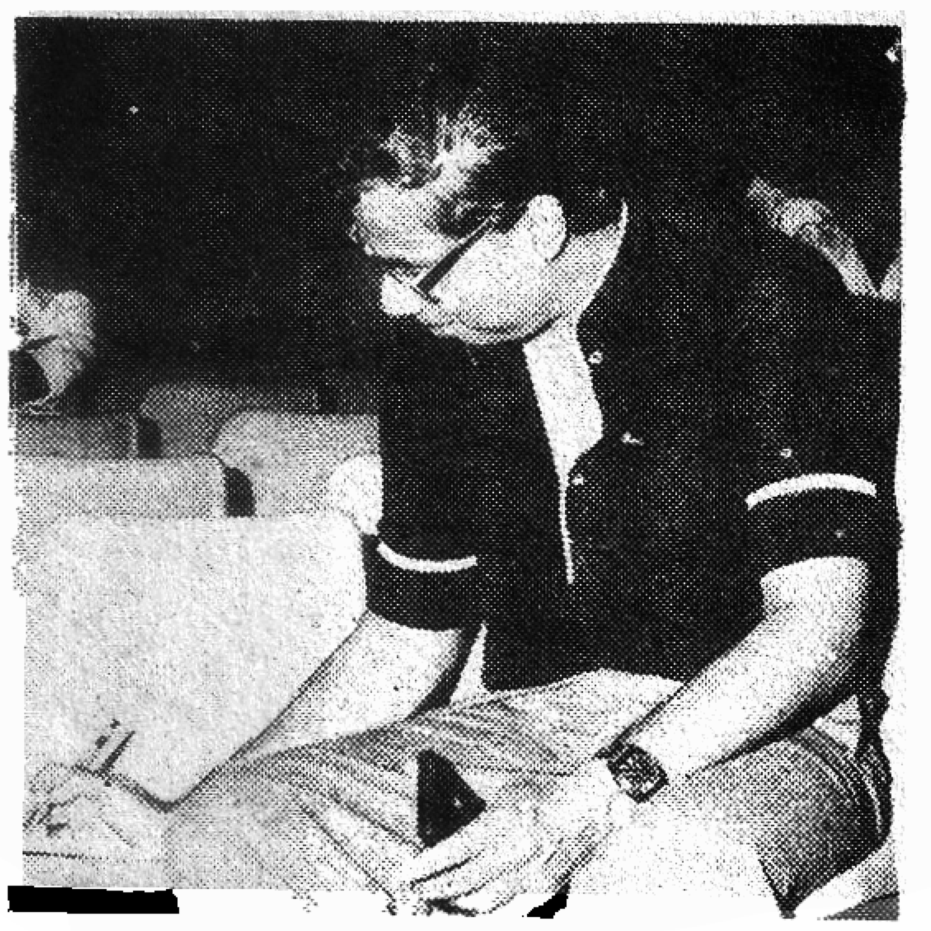
ভারত-রাশিয়া ম্যাচের পর অমল দত্ত

‘প্রদীপ এই পাঁচ মাস ধরে কী করল?’

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে বাংলা দলের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হচ্ছে। হাতে যথেষ্ট দিন আছে বলে বাংলার কোচ অমল দত্ত নেহরু গোল্ড কাপ দেখতে ত্রিবান্দ্রামে এসেছেন। বললেন, ‘এখানে ভাল ভাল টীম এসেছে, কোন টীম কতটা এগচ্ছে, দেখতে এলাম।’ প্রতিদিন সকালে নিজেও মাঠে দৌড়চ্ছেন। এবং পরে বিদেশী টীমগুলোর প্র্যাকটিস দেখছেন। ম্যাচ চলাকালীন ভি আই পি আসনে বসে নিজস্ব নোটবুকে অনেক কিছু টুকে রাখছেন।

যেদিন তিনি এর্নাকুলামে পৌঁছলেন, তখন রাত দেড়টা। এর্নাকুলাম থেকে ত্রিবান্দ্রামে আসার কোন ট্রেন না থাকায় স্টেশনে ফাঁকা ট্রেনের কামরায় বাকি রাত কাটলেন। বললেন, ‘এটা নতুন কিছু নয়। এভাবে আমার অনেক কষ্টের রাত কেটেছে।’ ভারত-রাশিয়া ম্যাচ দেখে তিনি এতই হতাশ যে বলেই ফেললেন, ‘প্রদীপ এই পাঁচ মাস ধরে কী করল? আমি ভেবে পাচ্ছি না যার হাতে এত ক্ষমতা, সে কেন একটা টীমকে দাঁড় করাতে পারল না’।

অমল দত্ত বললেন, ‘লীগ চলার সময় প্রদীপ প্লেয়ারদের যখন খুশি যাকে খুশি ডেকে নিয়েছে


ভি আই পি বক্সে ‘নোট’ নিতে ব্যস্ত অমল দত্ত
ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়

ক্যাম্পে। ক্যাম্পের পিছনে তিরিশ লক্ষ খরচ হয়েছে। এত কিছু করার পর আমরা কি এই ফুটবল ইন্ডিয়া টীমের কাছ থেকে আশা করেছিলাম? নতুনত্ব কিছুই ত দেখলাম না। আজ যদি প্রদীপ অজুহাত দেখায় আমরা মানব কেন? ও জানত নেহরু কাপে তরুণ, অলোকও সুদীপকে পাবে না। বেণী-মস্তানকে নিয়ে ও ত অনেক বড় বড় কথা বলেছিল। নতুন অনেক প্লেয়ার, টীমে আসার পর বলেছিল স্টার প্লেয়ারদের লড়ে জায়গা করে নিতে হবে টীমে আসার জন্য। ম্যাচ দেখে আমার মনে হল যাদের প্রদীপ বড় করে দেখাচ্ছিল তাদের চেয়ে ভাল প্লেয়ার বাইরে পরে আছে। কেন তনুময় ও বিজয় কুমারকে ডাকল না। অতনু যখন বাজে গোল খেল আমি হলে সেই জায়গায় তনুময়কে নামাতাম’।

ভারতীয় টীম সম্পর্কে অমল দত্ত বললেন, কোন কম্বিনেশন তৈরি হয় নি। লড়াই করতে যে মরিয়া চেষ্টা থাকে, সেটাও ছিল না। আমি কখনই ভাবি নি রাশিয়াকে ইন্ডিয়া হারাতে পারবে। কিন্তু ভাল টীমের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে ত একটা স্ট্যাটেজি থাকবে। ইন্ডিয়া টীম কী ছকে খেলল প্রদীপও বোঝাতে পারবে না। মিডফিল্ডে কোন স্ন্যাচার রাখে নি। এতদিনে কেন সেই ধরনের কোন প্লেয়ার তৈরি করতে পারল না? সঞ্জীব ভট্টাচার্যকে রাখতে পারত। প্রদীপের ত বড় বড় কথা, স্টপারে আর মিডফিল্ডে তরুণ-সুদীপের বিকল্প কেন আনতে পারে নি? পারমিন্দরকে আমি হলে খেলাতাম না। জো ডি সিলভার জায়গায় সুবীরকে নামাতাম। আমি ত এই টীমের কোন ভবিষ্যৎ দেখছি না।’

সাধারণ মানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দর্শকদের মন কাড়ে নি। ভারত ঝড়ের মত ম্যাচ শুরু করতেই দর্শকরা নড়েচড়ে বসলেন। পঁচিশ হাজার দর্শকের চিৎকার পি কে-র টীমের জন্য মিনিট দশেক স্থায়ী ছিল। এবং তারপর রাশিয়ার আক্রমণের ঢেউয়ের নিচে ভারত ঢেকে গেল। যে-কবার ঢেউয়ের চাপ থেকে মাথা তুলে মানি, শিশির, জো ডি'সিলভা ও আমজাদরা বিচ্ছিন্নভাবে স্বপ্নের মত সুযোগ পেল গোল করার, তার এক-দুটো রাশিয়ার জালে ঢুকলে ভারত বড় গ্লানি থেকে রক্ষা পেত।

রাশিয়ার গোল পাওয়ার পিছনে যতটা না কৃতিত্ব, তার চেয়ে বেশি ব্যর্থতা ভারতীয় ফুটবলারদের। ম্যান না ধরে খেলার জন্য, ভুল পাসের ছড়াছড়িতে ভারত নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রথমার্ধে তিন গোলে এগিয়ে থাকার পর রুশীরা ম্যাচে ঢিলেমি দিয়েছিলেন। ভারত একটু সাহসী হল। কিন্তু ওঁদের সংগে আমাদের ফুটবলারদের এতই ফারাক সব দিক দিয়ে, সাহসীকতাটা সেই নিজস্ব পাড়ায় মস্তানি দেখানর মত। ততক্ষণে গ্যালারি থেকে বিদ্রুপধ্বনী আসতে শুরু করে দিয়েছে। দু-দেশের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলেও, যে মুহূর্তে রাশিয়ার কোচ দেখলেন তাঁর খেলোয়াড়রা গা আলগা দিয়েছেন, অমনি মাঠের বাইরে থেকে একবার হুঙ্কার দিলেন এবং ম্যাচের শেষ সাত মিনিটে নির্দয় হয়ে রুশীরা আরও তিন গোল ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মধুর সম্পর্কের চুক্তি ভুলে ভারতকে নিজের মাটিতে ‘ছোট’ করে দিলেন! রাউন্ড রবীন লীগে গোলের গড় সব টীমই বাড়াতে চায়। রাশিয়া প্রথম ম্যাচে রুগ্ণ ভারতীয় টীমকে পেয়ে গোলের গড় বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নির্দয় হল। ম্যাচের পর রুশী কোচ স্বীকারও করলেন, “আমরা তিন গোলের বেশি চাইতাম না। কিন্তু আপনাদের ইন্ডিয়া টীমকে পেরু ও ইস্ট জার্মানও চার-পাঁচ গোল মারবে। তাই গোলের মার্জিনটা রাখতে হল ছয় গোল দিয়ে।

রুশী কোচ আমাকে এবং পি কে ব্যানার্জিকেও পরে বলেছেন, এত অনভিজ্ঞ ও নতুন ছেলে নিয়ে এই ধরনের টুর্নামেন্টে খেলা উচিত হয় নি। রুশী কোচ শেরগী মোসেইন বললেন, “ইন্ডিয়ার প্লেয়ারদের স্কিল, স্ট্যামিনা ও হাইট যা দেখছি, ইন্ট্যারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে এই টীম একেবারেই অযোগ্য।”

ভারতের ছয় গোলের ম্যাচ দেখে অন্য বিদেশী ফুটবলাররাও গ্যালারিতে বসে হেসেছেন। দর্শকরা ধিক্কার জানিয়েছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ত্রিবান্দ্রামের মাটিতে রাশিয়ার দাপটে ভারতীয় ফুটবলের আশা হতাশার দ্বন্দ্ব তীব্র হল। সতের জানুয়ারি অবশ্য হতাশায় দগ্ধ হয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিল ভারতীয় দল।

ভারতীয় শিবিরে কারর চোখে ঘুম ছিল না

কলকাতার বোখুমের কাছে



পঞ্চম নেহরু গোল্ড কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছবি সুম-

কলকাতার ফুটবলাররা ছয় গোল হজম করে যখন গ্র্যান্ড হোটেলে ফিরেছিল, ওদের চোখে-মুখে তেমন গ্লানি ছিল না। রাশিয়ার কাছে ‘ছয় গোল’ ফুটবলারদের মুখের সব ভাষা কেড়ে নিয়েছিল। লজ্জায় ও গ্লানিতে এবং দুঃখে ওরা সেদিন রাতে খাবার টেবিলে কেউ যেতে চাইছিল না।

রাত দশটা নাগাদ পি কে ও অরুণ ঘোষ গিয়ে খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে যান। মাথা নিচু করে ওরা অল্প খেয়ে নিজেদের রুমে চলে যায়। কিন্তু পরে খেলোয়াড়রা জানতে পারে পি কে এবং অরুণ ঘোষও খান নি। অনাদি বড়ুয়া গিয়ে ৫০২ নম্বর রুমে পিকেকে বলল, “স্যার আপনি না খেলে আমরা আরও কষ্ট পাব। ছয় গোল খেয়ে আমাদের কষ্টের ও লজ্জার শেষ নেই। আপনি খেতে চলুন।”

চোখে জল চলে আসছিল পি কে ব্যানার্জির। কোনক্রমে সামাল দিয়ে অনাদিকে বললেন, “তোমাদের ওপর রাগ করে খাচ্ছি না, তা কিন্তু নয়। আমার কিছুই ভাল লাগছে না, এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ভাল ছিল। তোমরা ত জান, বাড়ি ও নিজের সুখ ছেড়ে দিয়ে ফুটবল নিয়ে পড়ে আছি। আমার মত আর কেউ ব্যর্থতায় কষ্ট পায় না।” শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের মত পি কে, অরুণ ঘোষ, গ্যাব্রিয়েল ও ট্যান্ডনঅল্প খেয়ে ফিরে আসেন।

কিন্তু ভারতীয় শিবির থেকে

অমল দত্তর সমালোচনার জবাবে পি কে বললেন

‘অমলদা ক’টা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ দেখেছেন ?’

টুর্নামেন্ট শুরুর চব্বিশঘণ্টা আগেও ভারতীয় শিবিরের ‘স্পিরিট’ দেখে সাংবাদিকরা বলতে শুরু করেছিলেন, ‘ইন্ডিয়া লড়বে’। পি কে ব্যানার্জি বলেছিলেন, “প্রথমবার নেহরু কাপে আমি কোচ ছিলাম। টীম দারুণ খেলেছিল, চতুর্থ স্থান পেয়েছিলাম, আমি চেষ্টা করব এবার যেন তৃতীয় স্থান পায়।” উৎসাহের জোয়ারে ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা পর্যন্ত ভারতীয় দল ভেসেছিল।

পি কে বলেছিলেন, “রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমার ছেলেরা দারুণ লড়বে। ওরা ভাল টীম। কিন্তু ওদের সহজে খেলার জায়গা আমরা দেব না। ছেলেরা চিনে-জোঁকের মত তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। বোখুমের বিরুদ্ধে যে স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলাম, সেটাই এই ম্যাচেও থাকবে। আর কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে গোলের চেষ্টা করবে।”

ম্যাচের পর ভারাক্রান্ত মনে পি কে বললেন, “যা বলে দিয়েছিলাম তার কোনটাই ছেলেরা মনে রাখতে পারল না। একের পর এক ভুল করতে থাকল, ফলে ম্যাচটা রাশিয়ানরা সহজে ধরে নিল। অতনুও যে এত ভুল করবে ভাবতে পারি না। বেণী ও মস্তান একলাইনে দাঁড়িয়ে খেলে গেল। ওদের গোলগুলো আমার ছেলেরাই তৈরি করার সুযোগ করে দিয়েছে।



অফ সাইড ট্র্যাপে খেললে রাশিয়ার অনেক অ্যাটাক নষ্ট হয়ে যেত। সেই বুদ্ধিও আমার ছেলেদের নেই।”

ফুটবলারদের চেয়ে পি কে-ই সমালোচনার শিকার বেশি হয়েছেন। বললেন, “সবই আমার কপাল। ছয় গোল খাওয়ার পর আমার কোন জবাব দেওয়ার জায়গা রাখে নি। সব সমালোচনা আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। গোলের সুযোগ শিশির, মানি, জো ডি সিলভা ও আমজাদ পেয়েছিল। রাশিয়ার বিপক্ষে এর চেয়ে সহজ সুযোগ আর কটা পাওয়া যায় ? মিডফিল্ডে পারমিন্দারও ব্যর্থ। আমার এতদিনের সব চেষ্টা ও পরিশ্রমকে ধূলিসাৎ করে দিল। আমার অবস্থা এখন যিশু খ্রিস্টের মত, নিঃশব্দে আমাকে বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা সহ্য করে যেতে হবে। টীমের পরিবর্তন আনব। তরুণ, অলোক, সুদীপ বিশু ও কৃশানু আসলে টীমের কিছুটা চেহারা বদলে যাবে। বেণী-মাস্তানকে দিয়ে চলবে না। তরুণ ও ডেরেক পেরেরা খেললে স্টপারের জায়গাটা মজবুত হবে। ছয় গোল খাওয়ার মত আমার টীম খেলেনি। কিন্তু ছ’টা গোল হয়ে যাওয়ার পর এখন কোন কথা কেউ শুনবে না।”

অমল দত্ত বলেছেন, এই টীমের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছে না পি কে ব্যানার্জি পাঁচমাস ধরে এবং কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে কী করল। ভারতের খেলায় কোন ছকও ছিল না। অমল দত্তর অভিযোগের জবাবে পি কে বললেন “আমার যন্ত্রণা আমি বুঝছি। বাইরে থেকে অনেক কিছু বলা সহজ। অমলদা কটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ দেখেছেন ? কী-সব প্লেয়ার নিয়ে আমি লড়াই করে যাচ্ছি অমলদার পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। এমনিতে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এতদিনে সেটাকে আমি তুলে এনেছিলাম কিছুটা। হঠাৎ সেটা ‘শূন্য’তে নেমে আসল। আবার আমাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।”

সেদিন সুখ কর্পূরের মত উড়ে যায়, ফলে যে শূন্যতা পঙ্কজ হোটেলে ৩১৪ নম্বর থেকে ৫০২ নম্বর রুমে ছড়িয়ে ছিল তাতে কারর ঘুম একটুও হল না। পরের দিন অধিনায়ক অতনু বলল, “জীবনের প্রথম ইন্ডিয়া টীমের ক্যাপ্টেনশিপ করার সুযোগ এল, প্রথম ম্যাচেই আমার ক্যাপ্টেনশিপে ছয় গোল! সবাই আমায় দোষ দিচ্ছেন। আমি ত জানি, ম্যাচে আমি কী দারুণ অসহায় হয়ে গিয়েছিলাম। ওদের এক-একটা আটাক আসছে, দেখছি আমাদের কোন প্লেয়ার ধারে কাছে নেই। কী করব ভেবে না পেয়ে গোল ছেড়ে আমাকে বেরিয়ে অ্যাটাক রুখতে হয়েছে। আমি কারও ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি না। এরপর যতই ভাল খেলি, ছয় গোলের দুঃখজনক স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারব না।”



গ্যালারিতে বসে ভারতীয় ফুটবলাররা খেলা দেখছেন — ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়

১৮ জানুয়ারি দুপুরে কড়া রৌদ্রেও ফুটবলাররা প্র্যাকটিস থেকে বিরত থাকে নি। প্রশান্ত বলল, “রাতে চোখ বন্ধ করছি ঘুমানর জন্য, কিন্তু ছয় গোলের কথা মনে পড়তেই আতঙ্কে আর ঘুম আসছে না। ভোর রাত থেকে জেগে থাকছি।” বেনী-মস্তান গুটিয়ে গেছে ভয়ে। বেনী বলছিল, “পি কে-দার কাছে যেতে পারছি না। আমাকে ও মস্তানকে তিনি যে সুযোগ দিয়েছেন, তার মর্যাদা রাখতে পারলাম না। রাশিয়া যা খেলছিল, আমরা কাকে ধরব, কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।”

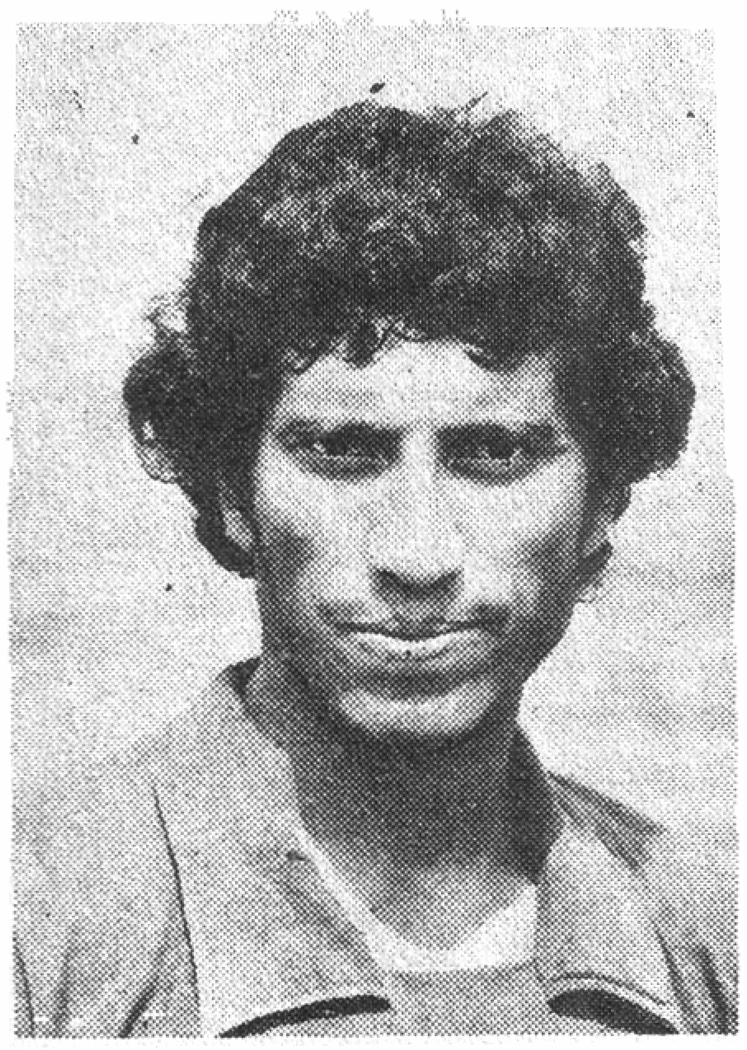
কলকাতায় মহমেডান স্পোর্টিং থেকে বেনী-মস্তান ‘অফার’ পেয়েছে। মস্তান জানতে চাইল, ‘ছয় গোল খাওয়ার পর কলকাতায় খেলতে গেলে পাবলিক গালি-গালাজ করবে না ত? এমন ভাবে জিজ্ঞেস করছিল যে আমারও হাসি পেয়ে গেল। কলকাতায় খেলতে চায় সরফ আলি, তরুণ রায় ও অনাদি বড়ুয়া। ছয় গোলের পর ওরা এখন আর কলকাতায় খেলার কথা বলছে না।

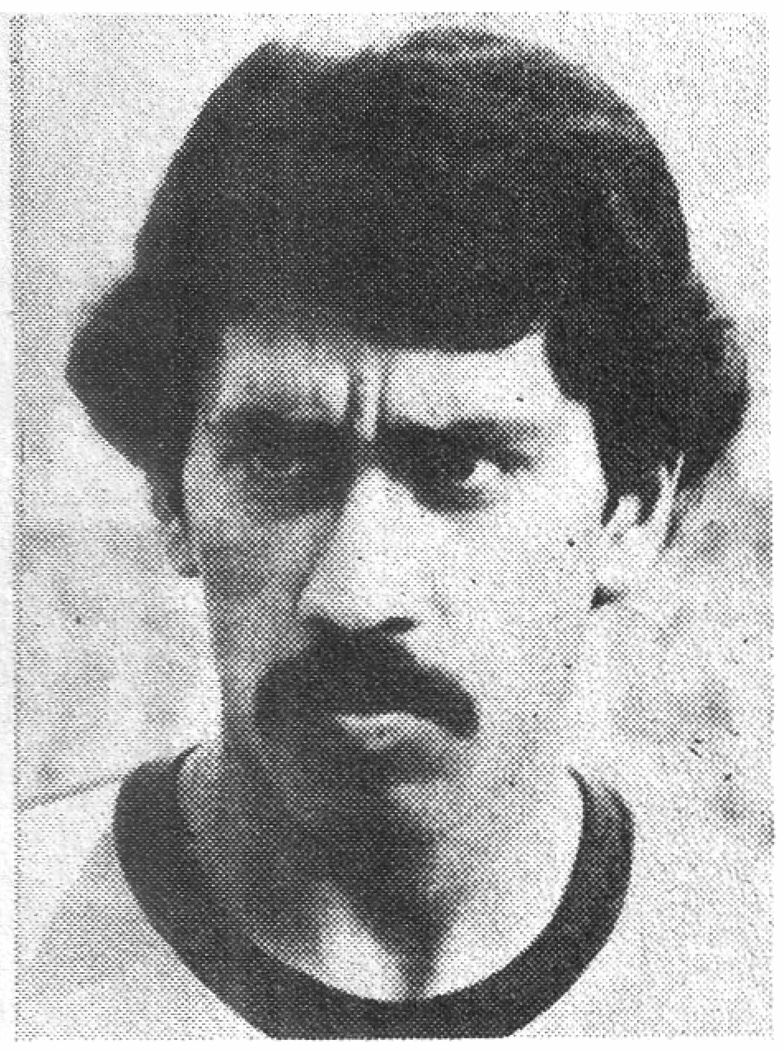
প্রসংগ: ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচন

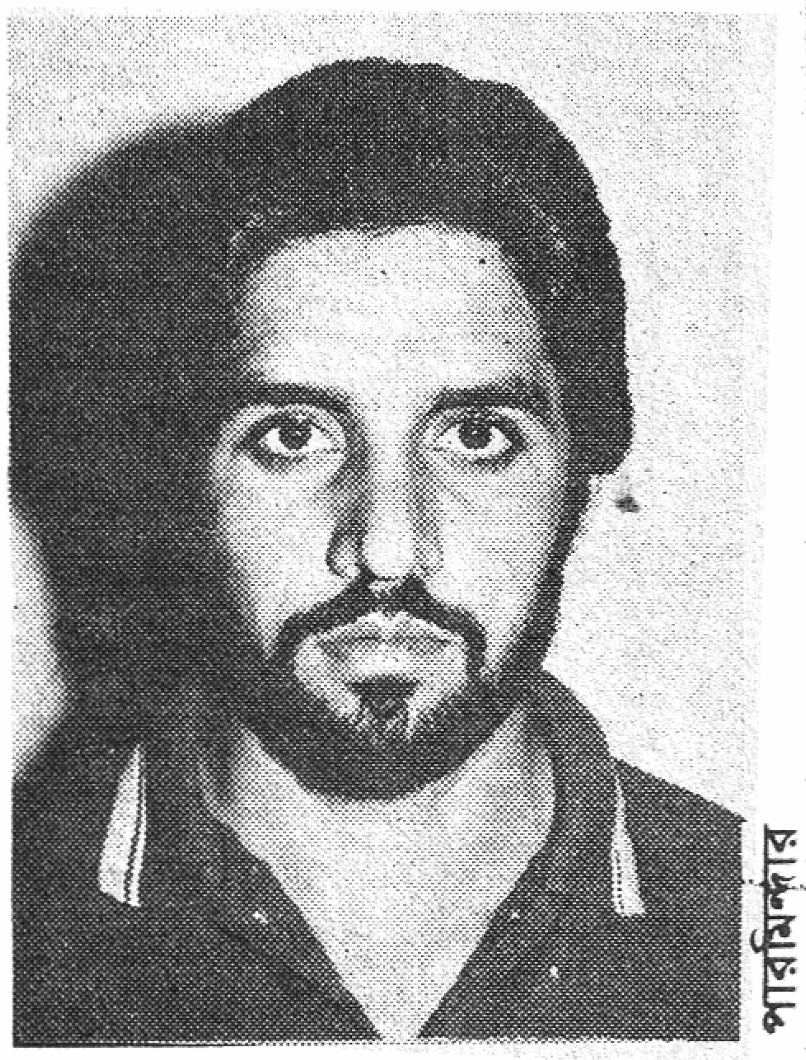
প্রশান্তকে চেয়েছিলেন পি কে   কেউ প্রশান্তর নাম তোলে নি: লক্ষ্মণন

মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে: প্রশান্ত   সুদীপ নেই, ক্যাপ্টেন হব জানতাম: অতনু

'নো কমেন্টস': পি কে ও অশোক ঘোষ







নেহরু গোল্ড কাপে পাঁচ-বারের মধ্যে তিনবার অধিনায়ক হল গোলকীপাররা। প্রথম নেহরু গোল্ড কাপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিল ভাস্কর গাংগুলি। পরের বছরে ব্রহ্মানন্দ। এবারে অতনু।
অল স্টারের হয়ে খেলতে যাবে বলে অতনুর জায়গায় দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে আলফান্সোকে রাখা হয়েছে। পনের জানুয়ারি বিকেলে অতনু জানতে পারে, ও অধিনায়ক হয়েছে। অতনু বলল, "সুদীপ নেই, আমি মনে মনে জানতাম ক্যাপ্টেন হব। কিন্তু আমি ক্যাপ্টেন হওয়াতে কেউ অসন্তুষ্ট নয়। আমাকে সবাই ভালবাসে। যদি ক্যাপ্টেন হতাম, তাহলেও দুঃখ থাকত না।'
বাইশজনের দল এবং অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে এবারেও বিতর্কের শেষ ছিল না। এ আই এফ এফ-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা-বিরোধী। তাঁরা চাইছিলেন না বাংলার কোন ফুটবলার অধিনায়কত্ব পাক। চীফ কোচ পি কে ব্যানার্জি প্রথমেই প্রশান্তর নাম তুললে সভা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পি কে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, "প্রশান্ত ইন্ডিয়া টীমে সিনিয়র। বোখুমের বিরুদ্ধে বাংগালোরে দারুণ খেলেছে। দায়িত্ব সচেতন ছেলে। ক্যাম্পেও ভালভাবে প্র্যাকটিস করে তার আগের ফর্মে ফিরে এসেছে। ওকে একটা ক্যাপ্টেনশিপের সুযোগ দেওয়া উচিত।"

এ আই এফ এফের কোষাধ্যক্ষ পি পি লক্ষ্মণন রাতারাতি বেশ ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন। ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা এখন ওঁকে সমীহ করে চলেন। দক্ষিণ ভারতে আগে আবদুল্লা, খলিলদের দাপট ছিল। এখন একা-লক্ষ্মণন সেই দাপট দেখাচ্ছেন। তিনি সভায় প্রথম প্রশান্তর বিরোধিতা করে বললেন, "যে ছেলে টীমে আসার যোগ্য নয় তাকে ক্যাপ্টেন করা উচিত হবে না। প্রশান্ত মোটেই ফর্মে নেই। তাছাড়া ওর উপর মিলোভানও ক্ষুব্ধ ছিলেন। মিলোভানকে ও নানাভাবে হেনস্থা করেছে একটি দৈনিক পত্রিকায় মন্তব্য করে।" সভায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ না ঘটে যায়, এইভেবে অশোক ঘোষ বললেন, 'এই মুহূর্তে যাকে ছাড়া ইন্ডিয়া টীম ভাবা যায় না, আমরা তাকে ক্যাপ্টেন করব। আমার ত মনে হয় অতনুকে ক্যাপ্টেন করাটাই ঠিক হবে। কেননা, ও অলস্টার টীমে সুযোগ পেয়েছে। অতনুর কোন বিকল্প নেই। ওকে একটা সম্মান দেওয়া উচিত।"

অতনুর দিকে সমর্থন থাকলেও, নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান পাঞ্জাবের কে কে কাপুর একবার বললেন, "পারমিন্দারকে একবার ক্যাপ্টেনশিপের সুযোগ দেওয়া উচিত।" আবদুল্লা বললেন, "পারমিন্দার ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হয়েছে।" পি কে এবার মুখ খুললেন। "পারমিন্দার খুব ভাল ফর্মেও নেই।" মাঝে একবার ব্রহ্মানন্দর নামও তুললেন পি পি লক্ষ্মণন। অর্থাৎ গোয়ার 'লবি'-কে খুশি করাই ওঁর উদ্দেশ্য। অশোক ঘোষ ও পি কে-র একটা যুক্তিতে সেটা খারিজ হয়ে গেল। 'অতনু থাকতে ব্রহ্মাকে ফার্স্ট টীমে ত খেলান যাবে না।' অতঃপর অতনুর নামই অধিনায়ক হিসাবে ঘোষিত হল। "ইন্ডিয়া টীমে অতনু ছাড়া আলফান্সো অত্যন্ত অপরিহার্য প্লেয়ার', অশোক ঘোষ পি কে-র মুখের কথা তুলে নিয়ে সংগে সংগে বললেন, "ঠিক আছে, অতনু অল স্টারের হয়ে খেলতে চলে গেলে ইন্ডিয়া টীমকে লীড করবে আলফান্সোই।"

পরে প্রশান্ত বলল, "আমার ওপর লক্ষ্মণনের কেন এত রাগ আমি বুঝে উঠতে পারছি না। অতনু এখন ইন্ডিয়া টীমের একনম্বর। ওকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে বলে আমি খুশি। কিন্তু আমাকে ক্যাপ্টেন না করার পিছনে যে-সব যুক্তি দেখান হচ্ছে তা হাস্যকর ও ভিত্তিহীন। প্লেয়ারদের জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে আমার সংগে মিলোভানের কীরকম সম্পর্ক। আমার সম্পর্কে কেউ কেউ মিলোভানের কান ভারী করার চেষ্টা করেছিল। মিলোভান পরে সব বুঝতে পারেন, আমার দিক থেকে কোন দোষ ছিল না। আর মিলোভানও ত লক্ষ্মণন ও এ আই এফ এফের কর্মকর্তাদের নামে অনেক কিছু বলেছিলেন। যতই ভাল খেলি, আমাকে ক্যাপ্টেন করা হবে না জানতাম। এটা বুঝে গেছি বলে আজ আর কোন দুঃখ নেই। তবে আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে বলেই আমার ক্ষোভ।"

পি পি লক্ষ্মণনকে ১৮ জানুয়ারি নেহরু গোল্ড কাপের অফিসে অধিনায়ক নির্বাচনের প্রসংগ তুলতেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "আমি মিটিংয়ে কোন কথা বলি নি।"

– "আপনি প্রশান্ত ব্যানার্জির নাম উঠতেই বিরুদ্ধাচারণ করেন নি?"

– "আমি? প্রশান্তর নাম কেউ তোলেন নি, বিরুদ্ধাচারণ করার প্রশ্নই আসে না। পি কে ও অশোক ঘোষ মিলে ক্যাপ্টেন ঠিক করেছেন।" লক্ষ্মণনের এই ধরনের মন্তব্য শোনার পর পি কে আর অশোক ঘোষ 'নো কমেন্টস' বলে থেমে গেলেন। ওঁরা 'নো কমেন্টস' বললেও, ফেডারেশনের অন্য একজন কর্মকর্তা জানালেন, লক্ষ্মণন ডাহা মিথ্যে কথা শুনিয়েছেন। শুধু প্রশান্ত কেন, আরও একটু বেশি ক্ষমতা থাকলে তিনি চীফ কোচের দায়িত্ব থেকে পি কে ব্যানার্জিকেই সরিয়ে দিতেন!

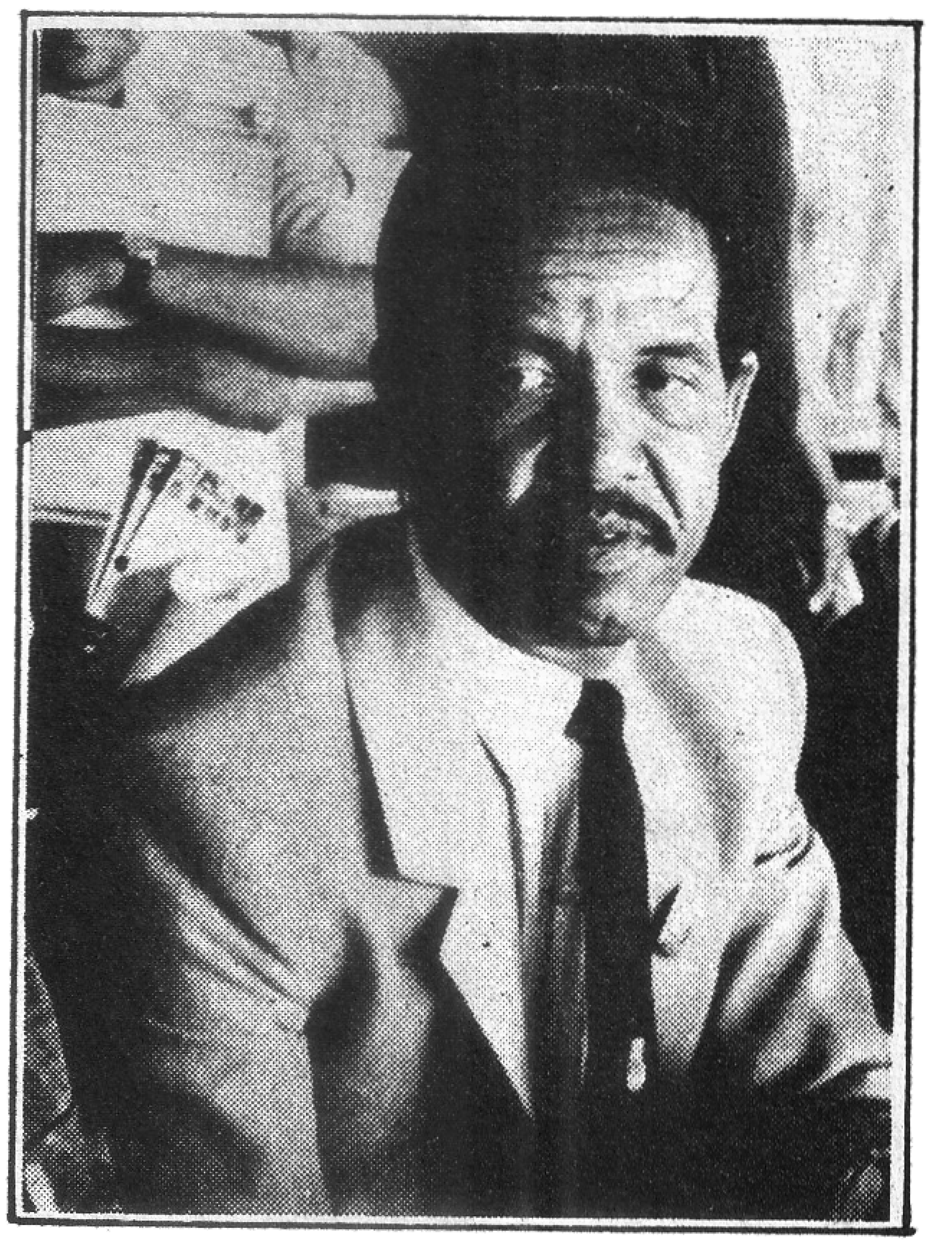


স্যার গ্যারি সোবার্স – ২ / গোপাল বসু

প্রিয় পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আন্দাজ করতে পারছেন যে তরুণ সোবার্সই যদি লিন্ডওয়াল ও মিলারের বোলিং এভাবে চূর্ণ করতে পারে তাহলে পরিণত, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পর সোবার্স কি অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন। হ্যাঁ, আপনাদের কল্পনাই নির্ভুল। সোবার্সকে সরাসরি কোন দ্বিধা বা ভনিতা না করেই সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন হিসাবে মানতে হবে। তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কারও সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন নেই। সোবার্স নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাটিং প্রতিষ্ঠান।

ফিল্ডার হিসাবে তিনি মাঠের যে কোন অঞ্চলেই অসাধারণ ও বিস্ময়কর। কভারে (যদিও তিনি কভারে কদাচিৎ ফিল্ডিং করেছেন) তিনি আপন যোগ্যতায় কলিন ব্ল্যান্ড বা নীল হার্ভেকে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলতে পারেন। পেস বোলিং-এ সোবার্স স্লিপে দাঁড়িয়ে এমন সব ক্যাচ ধরতেন যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ক্যাচ বলে ভাবা যেত না, তাঁর বিদ্যুৎগতির রিফ্লেক্স অসম্ভবকে সম্ভব করত। যখন ল্যান্স গিবস অফস্পিন বোলিং করতে আসতেন তখন তিনি শর্টলেগে দাঁড়াতেন (অধিকাংশ সময়েই ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে) এবং অমানুষিক অনুমান শক্তিতে গ্লান্স ও ডিফ্লেকশন থেকে অবাক করা ক্যাচ ধরতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যান নিশ্চিন্ত থেকে একটি বা দুটি রান করে স্ট্রোক নিতেন, কয়েক মুহূর্ত পরে হতাশ হয়ে প্যাভেলিয়নে যাত্রা করতেন।

সোবার্সের ফিল্ডিং সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা আমাদের, অর্থাৎ কলকাতার ক্রিকেট দর্শকদের হয়ত মনে আছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ইডেনে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের বুধি কুন্দেরণ ব্যাট করছিলেন, (বুধি বাউন্সার পেলেই হুক করতে চাইতেন) ফাস্ট বোলার ওয়েস হলের একটি বাউন্সারে কুন্দেরণ নিজের শরীরকে হুক করার মত নির্ভুল পজিশনে না নিয়ে গিয়ে হুক করলেন। ব্যাটসম্যান স্ট্রোক নেওয়ার বলের যেদিকে ছুটে যাওয়া উচিত দর্শকদের চোখ, খুব সঙ্গত কারণে সেদিকেই ছুটে যায়। ইডেনের সমস্ত দর্শকদের চোখ সেজন্য ডিপ ফাইন লেগ-লংলেগ অঞ্চলের দিকেই চলে গিয়েছিল। বলটি কিন্তু বুধির ব্যাটের ঠিক জায়গায় লাগেনি, কানায় লেগে উঁচু হয়ে ডিপ থার্ড ম্যানের দিকে উড়ে যাচ্ছিল, আমরা সকলে ব্যাপার কী ঘটল বুঝে ওঠার আগেই সোবার্স স্লিপ থেকে চিতা যেমন হরিণের দিকে ছুটে যায় সে রকম ভাবে বল লক্ষ্য করে থার্ডম্যানের দিকে ছুটতে শুরু করলেন, বলটি উঁচু হয়ে বাউন্ডারি সীমানার দিকে উড়ে যাচ্ছিল, দূরত্ব প্রায় ৬০ গজ হবে। আমরা সকলেই ভাবছিলাম সোবার্স কিছুতেই ক্যাচ-এর কাছে পৌঁছতে পারবেন না, ভাগ্য ভাল হলে বড়জোর বাউন্ডারি বাঁচাতে পারেন। সোবার্স কিন্তু প্রতিটি স্টেপ-এ দূরত্ব কমিয়ে আনছিলেন, সোবার্সের গতি বাড়ছিল এবং শূন্যে ওড়া বলটির কাছাকাছি চলে আসছিলেন। তার পর শেষ কয়েক গজে প্রায় উড়ে যাওয়ার গতিতে উড়ন্ত বলের কাছে পৌঁছে গিয়ে যেন আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে বোঝাতে চাইলেন কখনও সোবার্সের যোগ্যতা বিচারের চেষ্টা করো না। অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক দক্ষতায় সোবার্স দুটি হাতে বল পেয়ে গেলেন এবং আমরা মুহূর্তের জন্য ভাবলাম সোবার্স ক্যাচটি ধরে ফেলেছেন। এই চরম সময়ে ঈশ্বর বোধহয় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলেন, সামনে ঝুঁকে পড়া সোবার্স তখনও উল্কার গতিতে ছুটছিলেন, যখন তিনি বলের কাছে পৌঁছলেন এবং দুই হাতে বলটির স্পর্শ পেয়েছেন তখনই তাঁর নিজের হাঁটুতে



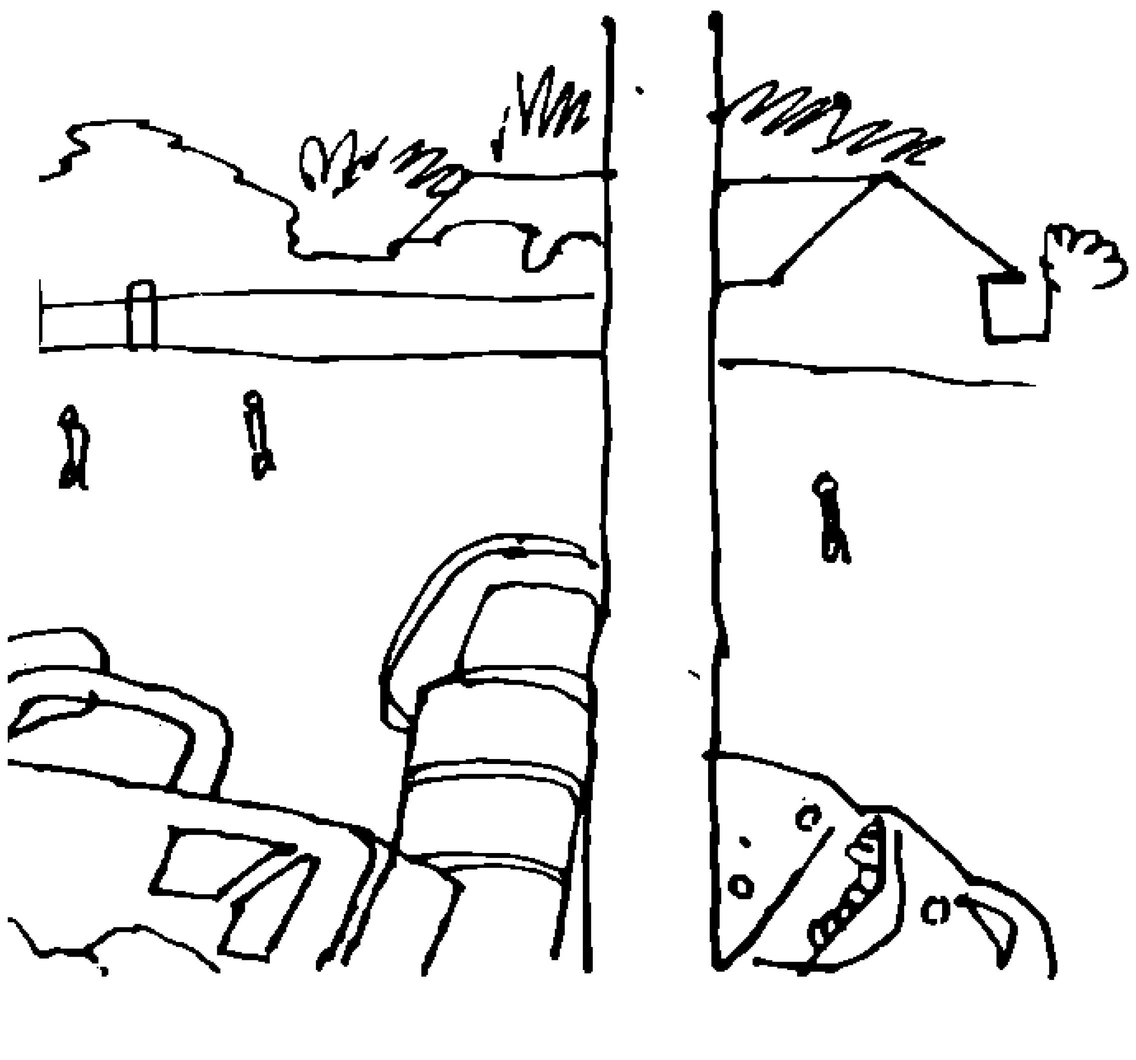
ক্যাচধরা হাঁটুতে ধাক্কা লেগে গেল এবং বলটি হাতের তালু থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। সর্বকালের সেরা বিস্ময়কর ক্যাচগুলির একটি সোবার্সকে ধরতে না দেওয়ায় আমি ঈশ্বরকে দোষ দেব না, যদি সোবার্স সেদিন ঐ ক্যাচটি ফেলতে পারতেন তাহলে যারা তার চমকপ্রদ ফিল্ডিং দেখেছেন তাঁরা সকলেই সোবার্সকেই পুজো করতে শুরু করতেন। ঈশ্বরকে নয়।

টেস্ট ক্রিকেটের সেরা ইনিংসগুলির মধ্যে স্ট্যান ম্যাকেব একাই এরকম তিনটি অমর ইনিংস খেলেছেন এবং স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ম্যাকেবের সব ইনিংসগুলিই দেখেছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের পক্ষে করা সোবার্সের ২৫৪ রানের ইনিংস দেখে ডন বলেছেন – "সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইনিংসগুলির একটি এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আমার দেখা ইনিংসের মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ।" এটা মনে রাখতে হবে যে সোবার্সের ইনিংসটি স্বীকৃত টেস্ট ম্যাচে খেলা হয়নি। কিন্তু যাই হক কিছুতেই সোবার্সের প্রায় অলৌকিক ইনিংসের গুরুত্ব ও যোগ্যতা কমে যায় না কারণ মন্তব্য করার আগে স্যার ডনের ম্যাকেবের ইনিংসগুলির কথা মনে ছিল।

সোবার্সের সেই ইনিংসটির উপর একটি ফিল্ম তৈরি হয়েছে, নাম 'স্যালুট টু সোবার্স'। ফিল্মে সোবার্সের ব্যাটিং-এর সঙ্গে ধারা বিবরণী দিয়েছেন সুনীল গাভাসকারের মতে যিনি 'আইডল অফ আইডলস' সেই অদ্বিতীয় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান।

ইয়ান চ্যাপেল বহুবার ইনিংসটি দেখার পর রিচি বেনোকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কোন উপায়ে সেই ইনিংসে সোবার্সকে শান্ত রাখা যেত কিনা (ইয়ান চ্যাপেলই সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন)। একটা কথা সম্ভবত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সোবার্সকে ঐ ইনিংসে আউট করার কোন চিন্তাই চ্যাপেলের মাথায় আসেনি, সোবার্সকে শুধু শান্ত রাখতে পারলেই চ্যাপেল খুশি হতেন। বেনো সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপেলের প্রশ্নের জবাব দেননি, সোবার্সের ইনিংসের ফিল্মটি আবার দেখার পর বেনো চ্যাপেলকে বলেছিলেন যে গালি ও পয়েন্ট ফিল্ডারকে সরিয়ে ফরোয়ার্ড ডিপ পয়েন্ট ও ব্যাকওয়ার্ড ডিপ পয়েন্ট হিসাবে দাঁড় করান যেত। উত্তর শোনার পর চ্যাপেল যখন বলেন যে সোবার্সের কয়েকটি স্কোয়ার কাট ক্যাচ ধরার মত উচ্চতায় গালি অঞ্চল দিয়ে উড়ে গেছে। এর জবাবে বেনোর উত্তর হিসাবে যে শব্দগুলি উচ্চারিত হয়েছিল তা চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। টেস্ট ক্রিকেটের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গালি ফিল্ডারের নাম বেনো কিনা এই নিয়ে তর্ক থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সেই সর্বকালের অন্যতম সেরা গালি ফিল্ডার বললেন "ইয়ান, সোবার্সের হিট সামলিয়ে গালিতে দাঁড়াতে পারে এমন ফিল্ডার এখনও জন্ম গ্রহণ করেনি।"

হ্যাঁ, শক্তি ও শিল্পময় সৌন্দর্য কখনও এত ছন্দোময় ঐক্যবন্ধনে মিলিত হয়নি। ক্রিকেট মাঠে সোবার্সের ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরার মধ্যে এক সহজ সৌন্দর্য ছিল, এমন কি সোবার্স যখন দৌড়তেন তখনও মনে হত তাঁর পা যেন মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে না, তাঁর শরীর যেন হাওয়ায় ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। বোলিং-এর সময় তাঁর বোলিং অ্যাকশনকে মনে হত কবিতার জীবন্ত প্রতিফলন। সব মিলিয়ে সোবার্স ছিলেন একজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাথেলীট। তা সত্ত্বেও এখন তিনি শরীরের দিক থেকে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। অতীতের অসাধারণ অ্যাথেলীট এখন দৌড়তে পারেন না। দুরন্ত অ্যাথেলীট থাকার সময়ে চলাফেরা দেখে যারা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ত তারাই এখন তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। খ্যাতি, নিশ্চিতভাবে খ্যাতিই বিখ্যাতদের কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়ে নেয়। বিখ্যাতদের মধ্যে বিখ্যাত, চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে সবার সেরা চ্যাম্পিয়ন স্যার গ্যারি সোবার্সের কাছ থেকেও খ্যাতি অনেক কিছু নিংড়ে নিয়েছে এবং সেই জন্যই



সোবার্স আজ প্রায় পংগু জীবন যাপন করছেন।

সোবার্সের চেয়ে বড় ক্রিকেটার আর কখনও ছিল? যদি থাকেও তাহলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করতে হয় সোবার্সের চেয়ে তিনি আর কী আরও ভালভাবে করতে পারতেন? আমি এ ব্যাপারে আর কিছু ভাবতে রাজি নই, এই প্রশ্নের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত পাগলা গারদে গিয়ে হাজির হব এবং সেটা খুব ভাল ব্যাপার হবে না।

বিচিত্র

আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে---- মোর ভালে বুঝি নেই রান লিখা হয়ত এই ধরনের অস্ফুট সংলাপ বেরিয়ে এসেছিল ম্যাকলিওডের মুখ থেকে। ১৮৯৬ সালে মেলবোর্ন বনাম নর্থ মেলবোর্নের খেলায় আর ম্যাকলিওড ম্যাচের দু ইনিংসেই রান আউট হয়েছিলেন একটিও বল খেলার সুযোগ না পেয়ে। ঠিক এই ধরনের দুর্ভাগ্যের খবর পাওয়া যায়নি এখনও।

বারবার প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানরা উইকেটে শিকড় নামিয়ে খেললে পরের ব্যাটসম্যানরা খেলার সুযোগ পাবে কি করে? রুট সাহেবের নিশ্চয়ই এই ধরনের বক্তব্য ছিল, আধুনিক যুগ হলে তিনি অবশ্যই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বসতেন। ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের সি এফ রুট পর পর তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন চিরশত্রু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু একটিতেও ব্যাট করার সুযোগ পাননি।

কমান্ডার ক্যাপটেন ও ট্রুম্যান

ফ্রেডী ট্রুম্যান জানতেন না জীবনের সবথেকে আশ্চর্য ক্রিকেট ম্যাচ তাকে খেলতে হবে এবং অখ্যাত আর্মি কমান্ডার-এর অধিনায়কত্বে। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৫৩ সালে।

লিন্ডওয়াল, মিলার, হার্ভে, বেনোর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক প্রদর্শনী-বেনিফিট ম্যাচে সম্মিলিত সার্ভিসেস দলের হয়ে খেলার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন ট্রুম্যান। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। সুতরাং আর্মি দলের সবথেকে নামী বোলার ও ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের ফাস্ট বোলার ট্রুম্যান স্বভাবতঃই বোলিং শুরুর জন্য গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বোলিং প্রান্তে। বুট দিয়ে নিজের বোলিং মার্ক ঠিক করে নিচ্ছেন, হঠাৎ কমান্ডার অধিনায়ক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন "এখানে কি করছ ফ্রেড?" ট্রুম্যান সহজভাবেই মাটিতে বুট ঘষতে ঘষতেই উত্তর দিলেন "বোলিং শুরু তো আমিই করব তাই মার্কিং করে নিচ্ছি।"

অধিনায়ক শুধোলেন "তুমিই কি বোলিং ওপেন কর?"

হ্যাঁ, আমিই

"ভালো, তবে আজকে নয়।"

বিস্মিত ট্রুম্যান অগত্যা গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর প্রিয় লেগস্লিপ অঞ্চলে।

ম্যাচের প্রথম ওভার শুরুর আগে কমান্ডার অধিনায়ক ফিল্ডিং পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ট্রুম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি লেগ স্লিপে ফ্রেড!"

ট্রুম্যান অবাক! "এখানেই তো আমি দাঁড়াই, টেস্ট দলেও, এবং সম্ভবত: এই জায়গায় আমিই এখন ইংল্যান্ডের সেরা।" অধিনায়ক – "হতে পারে। তবে আজকে তুমি ডীপ ফাইন লেগ।"

অবিলম্বেই ট্রুম্যানের পরিবর্ত ফিল্ডারের হাত থেকে পড়ল মিলারের মহামূল্যবান সহজ ক্যাচ এবং ট্রুম্যান নিজেও মেজাজ হারিয়ে তাঁর নিজের মত বল করতে পারলেন না। অস্ট্রেলিয়া সেই ইনিংসে করল পাঁচশরও বেশি রান যার মধ্যে মিলারের একাই দুশর বেশি। বোলিং-এ সার্ভিসেসকে কচুকাটা করলেন লিন্ডওয়াল এবং অপ্রতিরোধ্য মিলার।

কমান্ডার অধিনায়ক ম্যাচ জেতার আশা ধূলিসাৎ হওয়ার ম্যাচের শেষে ট্রুম্যানের সাথে মাত্র কয়েকটি কথা বলতে চাইলেন। ট্রুম্যান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন, অধিনায়ক বললেন, "আমি তোমাকে এখনই জানিয়ে দিতে চাই তোমাকে আর কখনও দলের হয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে না।" শান্ত গলায় ট্রুম্যান বললেন "ক্যাপ্টেন, এতক্ষন পরে তুমি একটা ঠিক কথা বলেছ। আর্মি থেকে আমি কয়েকদিন আগেই মুক্তি পেয়েছি। তাই ভবিষ্যতে আর্মি দলে খেলা আর আমার পক্ষে বোধহয় হয়ে উঠবে না।"

রজত চ্যাটার্জি

কুইজ ৭

১। টেস্ট ক্রিকেটের বিখ্যাত মহম্মদ ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে?

২। টেস্টে কোন ক্রিকেটারকে 'বেডসার্স বানি' বলা হত? কেন?

৩। ক্রিকেটের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত?

৪। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন কে?

৫। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে 'টেস্ট ডাবল' করেছেন কোন উইকেটকীপার?

৬। সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে 'টেস্ট ডাবল' করেছেন কোন অলরাউন্ডার?

৭। একটি সিরিজে সর্বাধিক সংখ্যক ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন কে?

৮। টেস্ট ক্রিকেটে একটি জুটি পর পর দুদিন ব্যাট করেছে – জুটিতে কে কে ছিলেন?

৯। টেস্টে একদিনে সংগৃহীত সর্বাধিক রান কত?

১০। টেস্টে একদিন সংগৃহীত সর্বাধিক রান কত?

১১। ক্রিকেটের প্রথম 'ক্রিকেট অ্যানুয়াল' কবে প্রকাশিত হয়েছিল?



উত্তর – কুইজ-৭

১। ওয়াজির মহম্মদ।

২। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার আর্থার মরিস, তিনি বারবার আলেক বেডসারের বলে আউট হতেন সে জন্য।

৩। লর্ডস-এ।

৪। জাভেদ মিয়াঁদাদ (পাকিস্তান), ২০৬ বনাম নিউজিল্যান্ড, করাচি, ১৯৭৬। জাভেদের বয়স তখন ছিল – ১৯ বছর ১৪১ দিন।

৫। অ্যালান নট, ২৫ বছর ১২০ দিন (৭ আগস্ট, ১৯৭১)।

৬। কপিলদেব (ভারত), ১ বছর ১০৭ দিন।

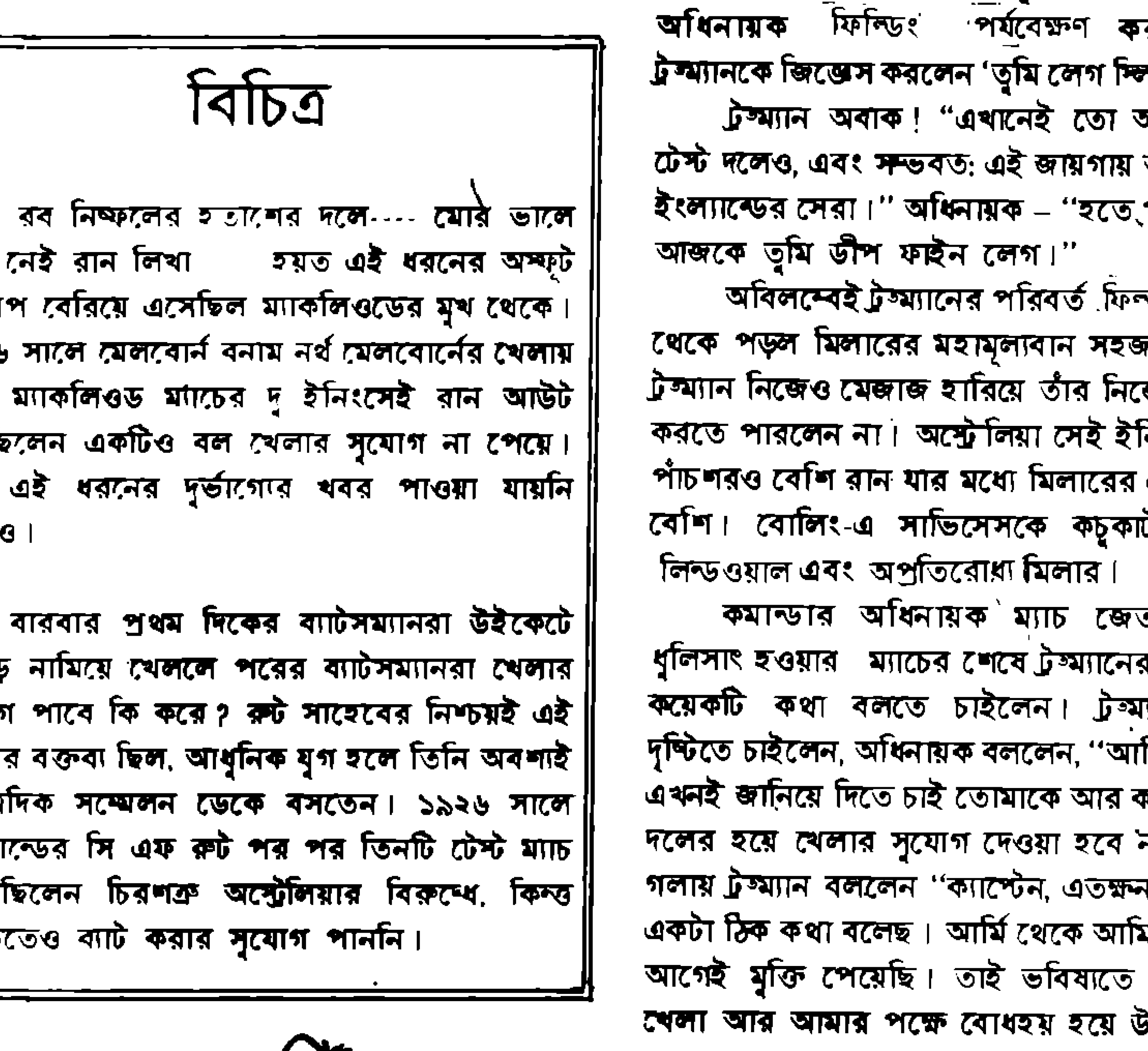
৭। স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান – ৩টি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে (১৯৩০)।

৮। গ্যারি সোবার্স (২২৬) ও ফ্র্যাংক ওরেল (অপরাজিত ১৯৭), ১৯৬০ সালে ব্রিজটাউনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চম দিন ব্যাট করেছিলেন, পঞ্চম দিনের শেষ ঘণ্টায় বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। ৯ ও ১০ জানুয়ারির মধ্যে ১০ জানুয়ারি বিশ্রামের দিন ছিল। মোট ৯ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে মোট ৩৯৯ রান যোগ হয়েছিল।

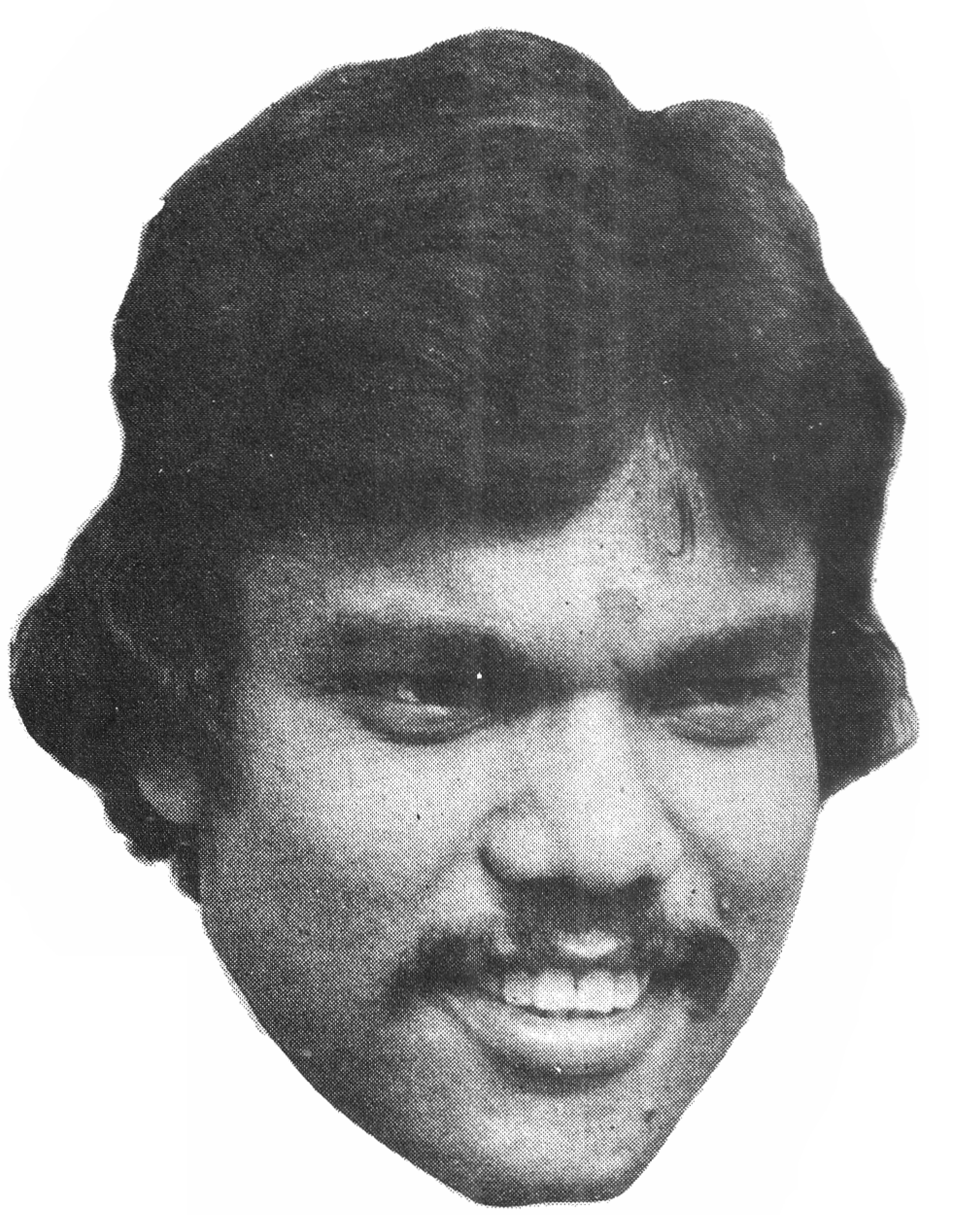
৯। ৫০৩ – ইংল্যান্ড, বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লর্ডস, ৩০ জুন ১৯২৪।

১০। ৯৫ – (অস্ট্রেলিয়া ৮০ এবং পাকিস্তান ২ উইকেটে ১৫ করাচি টেস্ট, ১৯৫৬)।

১১। ১৭৯১ সালে, প্রকাশ করেছিলেন স্যামুয়েল ব্রিচরে।



কার্টুন : দেবব্রত ঘোষ



ছবি: এস এম কাঞ্জিলাল

'অস্তিত্ব বাঁচাতে জীবনে একবারই, টানা পনের মিনিট ফুটবলারদের ভাষণ দিয়েছিলাম!'

পল্লব বসুমল্লিক

বিদেশে পারফিউম বা সুগন্ধীর জন্য চমৎকার একটা বিজ্ঞাপনী ভাষা ব্যবহার করা হয় – 'টু ফিল উইদিন'। অন্তরের কাছাকাছি থাকে যে গন্ধ। যার উপস্থিতি ভেতরে, কোন গভীরে অনুভব করা যায়।

মনোরঞ্জনের সংগে ব্যাপারটা তেমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ কয়েক বছর। বাইরে থেকে দেখার চেষ্টা করুন। এক রুক্ষ আত্মকেন্দ্রিক যুবককে পাবেন। অনেকে ত আবার তাঁকে বোম্বাই ফিল্মী ধাঁচে 'রাগী যুবকের' ইমেজ দিয়েছেন (সৌজন্য: অমিতাভ বচ্চন: ছবি দিওয়ার)। কিন্তু যারা মনোরঞ্জনের কাছাকাছি এসেছেন! পেয়েছেন তাঁর উষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত সান্নিধ্য? তাদের কাছে মনোরঞ্জনের হৃদয়ের শব্দ একই ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে। হয়ত তিনি পেরেছেন উজাড় করে দিতে, হয়ত আমরা পেরেছি দুহাত ভরে তুলে নিতে! তাতে ঈর্ষা করার কিছু নেই। পৃথিবীর সব মানুষই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ পোষণ করার অধিকার নিয়েই জন্মান।

পঁচাশিতে অসংখ্যবার মনোরঞ্জন তাকে মেলে ধরেছে। কথা, আলাপ-আলোচনা, ঘনিষ্ঠ আড্ডা তাকে আরও বেশিরকম বুঝে নেবার সুযোগ দিয়েছে। অন্তত, গোটা বছর এ প্রতিবেদকের সে অর্থে 'মনোরঞ্জন-ঘটিত' কোন সমস্যা হয়নি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই, এই পঁচাশিতেও কলকাতার ফুটবল অংগনে মনোরঞ্জন থেকে গেছে 'মোস্ট মিসআন্ডারস্টুড পার্সোনালিটি' হিসেবে। ১৯ জানুয়ারি, শীতের হাওয়া মাখান দুপুরে সে কথাই হচ্ছিল মনোরঞ্জনের সংগে। বরানগরে তার পাড়ায়, চায়ের দোকানে দুটো বেঞ্চে আমরা মুখোমুখি। টেপ রেকর্ডার, এমনকি নোটবুক-কলমেরও দরকার ছিল না! আপাতত দ্বিপাক্ষিক বিশ্বাসটা গভীরতার সে পর্যায়েই পৌঁছে গেছে।

'পোস্ট মর্টেম' আক্ষরিক অর্থে নিঃস্পন্দ লাশের ওপর দ্রুত সেরে নেওয়া হয়। পঁচাশির শরীর মনোরঞ্জনের সত্তায় এখনও পুরোপুরি মৃত নয়। তাই এ ফিরে দেখার আসরটাকে একটা 'অপারেশন'-ই ভাবা হক। ছুরি, কাঁচি, ফরসেপস্, ব্লেড – সে একই যত্ন এবং মমতায় চালাতে হয়েছে।

● মনা, পঁচাশি তোমার সেরা বছর হতে পারে না। কেন বলছি নিশ্চয় বুঝেছ?

●● যতদিন খেলেছি, যে কটা ম্যাচ খেলেছি – ভালই ত কেটেছে। তুমি আমার চোট আঘাত নিয়ে বলছ। হ্যাঁ, ভাইট্যাল সময়ে আমি মাঠের বাইরে থেকেছি। এই 'আউট অফ অ্যাকশন' হয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। মাঠের বাইরে না চলে আসতে বাধ্য হলে ক্লাবকে বেশি দিতে পারতাম – এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, তোমার ধারণা নির্ভুল। পঁচাশি আমার কাছে সেরা বছর নয়।

● পঁচাশির দলবদলের পর কিন্তু লাল হলুদ সমর্থকরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু ইস্টবেংগল কেন, ভারতের কোন দলই এত শক্তিশালী, এত ব্যালান্সড হয়নি?

●● মানছি তোমার বক্তব্য। এটা ত ঠিকই, এতজন প্রতিষ্ঠিত তারকা একসংগে কোন দলে খেলেনি। সুতরাং প্রত্যাশাগুলি বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে স্বপ্নের পর্যায়ে চলে যায়।

● আর ক্লাবের পারফরমেন্স?

●● খুব খারাপ কি? কয়েকটা জায়গায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বলতে পার ভাগ্য সহায় হয়নি। হিসেব কর না বরদলুই সেমিফাইনালে সালগাঁওকার ম্যাচ, আই এফ এ শীল্ডের সেমিফাইনালে পেনারল ম্যাচ আর ডি সি এম ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। শেষ দুটো টাই ব্রেকার অবধি গড়িয়েছিল। এখন বললে শুনতে খারাপ লাগবে, অনেকে বলবেন, 'অক্ষমের আবদার'। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ এবং সালগাঁওকার ম্যাচটায় গোল করার অনেক সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি।

তাছাড়া যে কটা প্রতিযোগিতায়

আমরা খেলেছি, ট্রফি এনেছি। ডুরান্ড আর রোভার্সে ত ক্লাব না খেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

● অনেকের ধারণা ইস্টবেংগ-লের সব ম্যাচ জেতা উচিত ছিল। দলের ভার এবং ধার ত তেমনই ছিল?

● ● যত ভাল দলই হক, একটা দুটো ম্যাচে ধাক্কা খেতে বাধ্য। পৃথিবীর যে কোন দেশেই এমন হতে পারে। যাঁরা হতাশ হচ্ছেন, তাঁদের হতাশা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতে পারছি না। ১৯৭৭ থেকে ইস্টবেংগলে খেলছি। এত ভাল দল জীবনে পাইনি। এত ধারাবাহিক ভাবে ভাল পারফরমেন্সও হয়নি।

● মনা, একমত হওয়া যাচ্ছে না। একটা ভাল ম্যাচ খেলতে নামার আগে কখনও কি জোর দিয়ে বলা গেছে এ ম্যাচ ইস্টবেংগল জিতবেই!

●● তা হওয়া সম্ভব নয়। ফুটবল এগারজনের খেলা। সমন্বয়ের একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া প্রত্যেকদিন কেউ তার সেরা ফর্মে থাকে না। এখন ত কথায় কথায় বিদেশী উদাহরণ টেনে আনা হয়। বিশেষজ্ঞদের ভেবে দেখতে বলবে – কলকাতার তিন বড় ক্লাবের ছেলেরা সারাবছর যত ফুটবল খেলে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন হয় কি? আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। সবাই নির্দিষ্ট দিনে তার সেরা খেলা দিতে পারলে ম্যাচটায় ইস্টবেংগল 'আউট-স্ট্যান্ডিং' হয়ে গেছে। এমন বেশ কয়েকবার হয়েছে।

● দলের 'কম্পোজিশন' বা গঠন নিয়ে কোন বক্তব্য আছে? কোন বিশেষ পজিশনে দুর্বলতা?

● সব দিক দিয়ে দলটা দুর্ধর্ষ ছিল। কিন্তু কোন পজিটিভ উইংগার ছিল না। এটাই একমাত্র সমস্যা। উইং দিয়ে আক্রমণ না করতে পারলে ডিফেন্স ভাঙ্গার সুযোগ পঞ্চাশ শতাংশ কমে যায়।

● এ কথাও ত সত্যি, তোমরা একটা চলনসই নতুন সিসটেমের জন্ম দিয়েছ এবছর। ৪–৩–৩ প্রথার এই সামান্য রকমফের দলে সবচেয়ে বেশি স্টার-এর খেলার সুযোগ করে দিয়েছে।

●● তোমার বক্তব্য নির্ভুল। কিন্তু উইং হাফ বা উইং ব্যাকদের দিয়ে আক্রমণ করিয়ে কত ভাল খেলা যায়। ধর, একটা শক্তিশালী বিদেশী দলের সংগে ম্যাচ। উইং ব্যাকরা কতটা ওঠার ঝুঁকি নেবে? উইং হাফদের ডিফেন্সের দিকে একটু নজর দিতেই হবে। তাই বলছি এ টীমেই একজন পজিটিভ উইংগার দরকার।

● একাধিক তারকা ফুটবলার একদিকে যেমন সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ তেমনই অন্যদিকে আরও বেশি ব্যক্তিত্বর সংঘাত ডেকে আনে'। 'ক্ল্যাস অফ স্টার্স'?

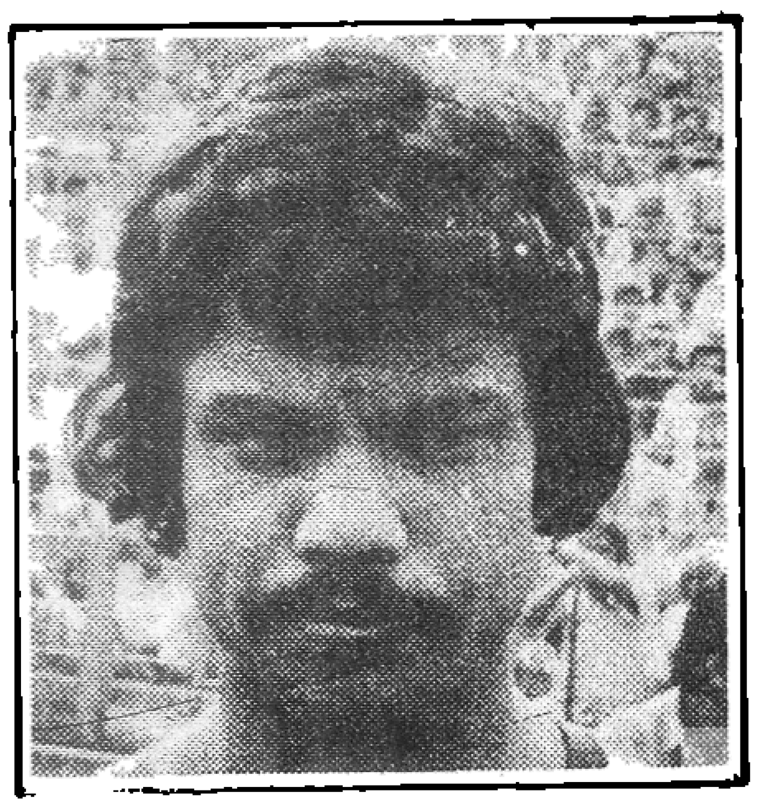
●● কেউ ছেলেমানুষ নয়। কোচ প্রথম এগারজনকে মনে মনে বেছে নেন। কেউ বারবার ব্যর্থ না হলে অন্যদের ঢোকা মুশকিল হয়ে পড়ে! সেট টীম অদলবদলের ঝুঁকি কেউ নেয় না। আমার ত মনে হয় দলে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে কারও সেভাবে ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই ত খেলেছে। প্রত্যেকেই মনে মনে আশা করে, সব ম্যাচে সে খেলবে। কিন্তু কোচ ত অন্যরকম পরিকল্পনা নিতেই পারেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি এবং বিচারশক্তিতে পুরোপুরি আস্থা রাখা উচিত। ভাল প্লেয়ার বসিয়ে বা সেট টীম রদবদল করিয়ে পারফরমেন্স খারাপ হলে দায়িত্ব ত কোচকেই নিতে

আগুনটা ছিল, তীব্র ক্ষোভ ছিল। সব মিলে মিশে একাকার হতেই সেরা ফুটবলটা বেরিয়ে আসে। কৃশানুর চাবুকের ঘায়ে প্রতিপক্ষ কাহিল হয়ে যায়। সব বলার পরও আমি মনে করছি, এ ঘটনায় কিন্তু প্রদীপদাকে পুরোপুরি দোষী করা যায় না। সিজনের শুরু থেকে কৃশানু খেলতে পারছিল না। প্রথম এগারয় সেট হতে পারেনি। আমরা সবাই ভাবছিলাম – এত ভাল ফুটবলার। হয়ত পরিবেশ এবং ক্লাব বদলের জন্য মানিয়ে নিতে অসুবিধে হচ্ছে।

● দেবাশিস মিশ্রও আই এফ এ শীল্ডের পর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

●● দল নির্বাচনের ব্যাপারে কখনও নাক গলাই না। ওটা আমার ধাতে নেই। কেন মিশ্র ক্ষুব্ধ হল, জানি না। তবে ও ত কম ম্যাচও খেলেনি। সুযোগ পেয়েছে অনেক।

● হতে পারে, ও মনে করেছিল



আড়ালে কেউ কিছু বললে, অনুরোধ করছি তাকে গুরুত্ব দিও না। সামনাসামনি বিবৃতি দেবার সাহস যারা সঞ্চয় করতে পারে না – তাদের কথা না শোনাই ভাল।

হয়।

● তুমি কি মনে করছ কোন ভুল হয়নি দল নির্বাচনে? লীগে মোহনবাগান-ইস্টবেংগল ম্যাচে কৃশানুর---?

●● এরকম দুয়েকটা ভুল হতেই পারে। হ্যাঁ, কৃশানু সেদিন প্রথম এগারয় ছিল না। ও কেঁদে ফেলে। কৃশানুর ভাবাবেগ বেশি, বয়স কম। তাছাড়া মোহনবাগানে যখন ছিল, ওকে ছাড়া ভাবাই যেত না দলটা। তাই ওর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে এটাই ত স্বাভাবিক। আমরা যারা সিনিয়র ফুটবলার, অনেক বুঝিয়ে কৃশানুকে জার্সি পরতে বলেছিলাম। বলেছিলাম সুযোগ তুই পাবি-ই। এবং তখন দেখিয়ে দিস। হয়ত ভেতরের এই চাপা

বিকাশ পাঁজির চেয়ে নিজে ভাল ফর্মে আছে। বিকাশ ত এ বছর ইস্ট-বেংগলে ধারাবাহিকভাবে সফল হতে পারেনি?

●● হ্যাঁ, মোহনবাগানে যে ফর্ম ছিল তা বিকাশ ধরে রাখতে পারে নি। তবে বিকাশের সংগে কৃশানুর বোঝাপড়া ভাল। রেজাল্ট পাওয়ার জন্যই কোচ দুজনের প্রতি বেশি আস্থা রাখেন। এতেও কোনও অন্যায় দেখছি না। মিশ্রর সংগে বিকাশের ত আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল না।

● পঁচাশিতে ইস্টবেংগলে কার কার পারফরমেন্স দারুণ লেগেছে? এক নাগাড়ে কে কে তাদের দক্ষতার শীর্ষে থাকতে পেরেছে?

●● সুদীপ, তরুণ, কৃশানু (পরের দিকে), জামশিদ (যতক্ষণ কন্ডিশনে ছিল), বলাই, অলোক মুখার্জি, ভাস্কর (চোট লাগার আগে)। একনাগাড়ে ভাল খেলতে পারা ব্যাপারটা মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে দেখান অনেক কঠিন।

● গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তোমার অনুপস্থিতি দু ধরনের ক্ষতি করেছে। একটা 'ডাইরেক্ট' অন্যটা 'ইনডাইরেক্ট'। তুমি কি একমত?

●● যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি সবার থাকা উচিত। মানছি, কয়েকটা জায়গায় দলে থাকলে হয়ত উপকৃত হত বাকিরা। কলম্বোয় খেলতে পারিনি। লীগে মোহনবাগান ম্যাচে সমস্যা হয়। আই এফ এ শীল্ড সেমিফাইনালে দল থেকে ছিটকে যাই। ডুরান্ড ফাইনালও খেলতে পারিনি। তুমি যে ডাইরেক্ট ক্ষতির কথা বলছ সেটা ডিফেন্সে আমার অনুপস্থিতি। কিন্তু এটার জন্য ত প্রস্তুতি থাকা উচিত। একটা দুর্ঘটনা, একটা কড়া ট্যাকল বা মাসল পুল – যে কোনদিন হতেই পারে। বরং ইনডাইরেক্ট ক্ষতিটা একটু বেশি হয়েছে। আমি না থাকলে টুলু (সুদীপ) স্টপারে চলে এসেছে। এতে মাঝমাঠে ম্যাচিং, ট্যাকলিং এবং গেম তৈরির 'স্পেডওয়ার্ক' বন্ধ হয়ে গেছে। এ সব গুণ টুলুরই আছে। আমাদের মিডফিল্ডারদের মধ্যে একমাত্র সুনির্মলের একটু ডিফেন্সিভ গুণ আছে। বাকিরা 'অ্যাটাকিং মিডিও'। ওরা খেলার ধাঁচ রাতারাতি পাল্টাতে পারবে কীভাবে? সুদীপের ত বিকল্প নেই। ও থাকলেই শক্তি, সমন্বয় অনায়াসে হয়। আমি থাকলে বড়জোর লড়াইটা একটু উসকে দিতে পারি।

● তোমাদের, মানে দলের অপরিহার্য তারকাদের বিকল্প তৈরি না করতে পারাটা কি কোচের সীমাবদ্ধতা বলে ধরে নেব?

●● অকারণে কোচকে দোষ দেবার নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। ধর ফেডারেশন কাপে একেবারে প্রস্তুতি ছাড়া কোচকে দল নিয়ে যেতে হয়। সেখানে ঝুঁকি নেবার কোন সুযোগ থাকে না। কলম্বোয় রিস্ক নেবারও উপায় ছিল না। লীগের শুরুর দিকে খেতাব পাওয়া মোটামুটি নিশ্চিত না হওয়ার আগে কোচ কী করবেন? সবাই ফার্স্ট ইলেভেন তৈরি করায়। সমর্থক সদস্যরা ত এত কিছু বোঝেন না। তাঁদের ট্রফি চাই। ট্রফি না দিতে পারলেই কোচকে গালাগালি করা হয়। বড় দলে কোচিং পরীক্ষা নিরীক্ষার জায়গা নয়। বিকল্প হিসেবে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে

নিজেকে তৈরি করতে হবে।

● এমন হতাশার মরসুম তোমার জীবনে আগে কখনও আসেনি ?

●● সত্যি তাই। এত বছর খেলছি, কখনও এতদিন মাঠের বাইরে একনাগাড়ে থাকিনি। হ্যামস্ট্রিং মাসলে টান ধরেছে। অবশ্য শরীরকে খুব একটা দোষ দিয়ে কি লাভ ? অত্যাচার ত কম হল না! যতদিন খেলছি, একটানা খেলেছি। হেন ম্যাচ নেই যাতে মাঠে নামিনি। ন্যাশনালস, আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ক্লাব, অফিস, [illegible] ...। মানুষের শরীর ত। আগে ছোটখাট চোট হয়েছে। একবার হাত ভেঙেছি, কিন্তু এবার সত্যি হতাশা আমায় দখল করেছে।

●● তুমি অভিজ্ঞ, চোটের জন্য কিন্তু লোকে তোমায় দায়ী করবে ? ঠিকমত ওয়ার্ম-আপ করনি ?

●● হয়ত ওয়ার্ম আপ হয়নি ভাল ভাবে। কলম্বো যাওয়ার আগে প্র্যাকটিস ম্যাচ কাদা মাঠে খেলা উচিত হয় নি। মাংসপেশীরও স্বাভাবিক ক্লান্তি বলে একটা ব্যাপার আছে। অথচ দেখ, প্র্যাকটিস হয়ত অনেকের চেয়ে বেশি করেছি। নিজে আলাদা প্র্যাকটিস করেছি। কিন্তু কেন যে এমন হল জানি না।

● বয়স কি একটা কারণ ? শরীর কি আগের মত খাটুনির ধকল নিতে পারছে না ?

●● না, না – বয়স কোন 'ফ্যাক্টর' নয়। আই এফ এ শীল্ডে গ্রুপ লীগে মোহনবাগানের সঙ্গে চোটটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। সবদিক দিয়ে মার খেলাম। লাথি বুকে লাগল। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়লাম, মাটিতে মাথার আছাড় লাগল। পায়ে লেগেছে বুঝিনি। কিছু বোঝা সম্ভব ছিল না। খেলোয়াড় বদলের কথা কি বলব ? কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে জানা সম্ভব ছিল না।

● ডাক্তারি পরিভাষায় একে 'মেন্টাল ব্ল্যাক আউট' বলে। তোমার তাই হয়েছিল ?

●● তাই, ঠিক তাই। এই যে তোমায় এখন এত বোঝাচ্ছি, এসব পরে শোনা কথা। আমার স্মৃতিবিভ্রাট হয়েছিল। নিকট এবং দূর অতীতের সবকিছু ভুলে যাই। সুদীপকে দাঁড়িয়ে উঠে প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম – ম্যাচের রেজাল্ট কী রে ? দু গোলে এগিয়ে আছি মনে ছিল না! শুধু জার্সি দেখে খেলছিলাম। আমার গোল এদিকে, বল এলে বাঁচাতে হবে এমন একটা অনুভূতি ভেতরে কাজ করছিল।' পায়ের চোটটা যে ছুটোছুটিতে বেড়ে গেল, সেটা পরে বুঝলাম।

অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল।

● তুমিই বললে – মরসুমের শেষদিকে জামশিদ কন্ডিশন হারিয়েছে। দলের সিনিয়র ফুটবলার হিসেবে ওকে উপদেশ দাও নি কেন ?

●● দিই নি, জামশিদ বলেই। ওকে আশি থেকে দেখছি। অনেক সিরিয়স ছিল তখন। এবার মরসুমের শেষদিকে একটু ঢিলেমি দিল। আমাদের দেশে বিশেষত মরসুমের শেষদিকে কন্ডিশন ধরে রাখার বিশেষ প্র্যাকটিসগুলো না করলে যত বড় ফুটবলারই হক, বিপদে পড়তে বাধ্য। জামশিদ ত পেশাদার ফুটবলার। শুধু ফুটবলই ওর জীবিকা। আমরা বাকি যারা আছি তারা ত চাকরি করি, সঙ্গে ফুটবল খেলি! সুতরাং এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকা উচিত জামশিদেরই। হয়ত ওর কোন সমস্যা ছিল। সত্যি হয়ত ও ফুটবলে ততটা মন দিতে পারে নি। কিন্তু হাবিবদা ত এমন করত না। ব্যক্তিগত দুঃখ-আনন্দ, বিপদ-আপদের কোন এফেক্ট পেশাদার ফুটবলারের খেলায় ফুটে ওঠা উচিত নয়। এতকিছু ভেবে মনে হয়েছিল জামশিদকে কিছু বলব না, নিজের ভুল ও নিজেই শুধরে নিক।

● ভাস্করের কথা কিছু বলবে ? মরসুমের শুরুতে চলনসই দ্বিতীয় গোলকীপার কিন্তু



ছবি : বিকাশ সাধু

ইস্টবেঙ্গলে ছিল না। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে খেলা চালাতে হয়েছে ?

●● শোন, ভাস্কর ফিট এবং কন্ডিশনে থাকলে পঁচাশিতেও ঘাবড়ানর কিছু নেই। ও একা টেনে দেবে। কিন্তু ভাস্করেরও ত চোট লেগে গেল। সে অবস্থায় বেচারা একদম বিশ্রাম পেল না। লীগে দেখ, কলম্বোর কথা ভাব। ভাস্কর বলেই বোধহয় চালিয়ে গেছে। ওর জেদের তুলনা নেই।

● মরসুমের মাঝে কোচ বদল, ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছ ?

●● সমস্যা হয় নি ত কোন। 'অল দি গুড ওয়ার্ক গোজ অন'। ছেলেরা বদ্ধপরিকর থাকলে লড়াই থেকে সরে যাবে কেন ?

● পঁচাশিতে কোচ পি কে ফুটবলারদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অল্প হারিয়েছেন ?

●● বলতে পারব না। আমি সেভাবে কিছু বুঝিনি।

● পাঁচ ছয় বছর আগেও ছেলেদের সঙ্গে পি কের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা অনেক মধুর ছিল। উনি গালাগাল দিতেন, উপদেশ দিতেন। ছেলেরাও সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে যেত ?

●● না, আমার কোন ব্যক্তিগত সমস্যা মেটাতে প্রদীপদার কাছে যাই নি – এটা বলতে পারি। অন্যরা কি করেছে আমার জানার কথা নয়। আর পাঁচ ছয় বছর আগে প্রদীপদা ফুটবলারদের সঙ্গে কী করতেন – এ সব আলোচনায় ঢুকতে চাই না। দিন বদলায়। সে সব ঘটনার সাক্ষী নই, সুতরাং মন্তব্য না করাই ভাল।

● কলম্বোর ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলবে ?

●● তুমি সামনে ছিলে। নতুন করে কিছু বলার নেই। পি কে পরেও নাকি বিবৃতি দিয়েছেন। আমি কিছু মনে রাখতে চাই না।

● এবছর নানা সময় ইস্টবেঙ্গলের বহু ফুটবলার আড়ালে প্রদীপদা সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করেছেন ? সে সব তোমার কানে গেছে ?

●● আড়ালে কেউ কিছু বললে, অনুরোধ করছি তাকে গুরুত্ব দিও না। সামনাসামনি বিবৃতি দেবার সাহস যারা সঞ্চয় করতে পারে না – তাদের কথা না শোনাই ভাল।

● পি কে দায়িত্ব ছেড়ে দেবার পরই হঠাৎ যেন ছেলেরা দারুণ উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। 'শ্যামদার জন্য' লড়াই – জান দিয়ে দেব, গোছের একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে। কিছু বলবে ?

●● হ্যাঁ, সেটা আমিই [illegible]ছিলাম আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগান ম্যাচের আগে। মোহনবাগান দুটো ট্রফি পাওয়ার পরই অনেক কথা বলছিল। কোচ, ফুটবলার, কর্মকর্তা সবাই। 'আজকাল'-এ নানা সুরের বিবৃতি বেরচ্ছিল। ভাবখানা এমন পেলে দেখে নেব। ওদের ছোট না করেই বলছি, এমন করা উচিত হয় নি। আমরাও ত কিছু ফুটবল খেলেছি। ট্রফি ওদের চেয়ে বেশি পেয়েছি। আমরা এমন জায়গায় ট্রফি জিতেছি যেখানে মোহনবাগান খেলেছে। কিন্তু ডুরান্ড-রোভার্স মোহনবাগান পায়, সেখানে অসুবিধে থাকায় আমরা খেলি নি। ব্যক্তিগত মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে গিয়েছিল তাই। শুধু শ্যামদার নয়, প্রত্যেক ফুটবলারই জড়িয়ে পড়ে।' অস্তিত্ব বাঁচাতে জীবনে একবারই, টানা পনের মিনিট ফুটবলারদের 'ভাষণ' দিয়েছিলাম! ম্যাচের আগের দিন তাঁবুতে বলেছিলাম – ওদের মাঠে পেলে দেখে নেব। খেলোয়াড়দের যুদ্ধ করার জায়গা হচ্ছে সবুজ মাঠ। প্রমাণ করতে হবে আমরা বড় দল। ক্লাসে সেদিন আরও অনেক কথা বলেছিলাম। অতীতের কিছু ঘটনা মনে করিয়ে দিই। সবাই জান, আমি বেশি কথা বলা পছন্দ করি না। যা করার মাঠে করতে হয়। তবু সেদিন, শীল্ডে ম্যাচের আগের দিন অন্যদের একটা ধাক্কা দেবার দরকার ছিল। বলেছিলাম হেরে যাওয়ার উপায় নেই।

ম্যাচের কথাই বলি। ভয়ংকর চোটটা লাগার পর এখনও জানি না কীভাবে খেলা চালিয়ে গেলাম।

আমার ভাবা না ভাবায় কিছু যায় আসে কি ? অমলদা যেটা ভাববেন সেটাই ফাইনাল। তবে তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন – দায়িত্ব দিলে বাংলার জন্য মনোরঞ্জন এখনও নিজেকে নিংড়ে দেবে।

'শ্যামদার জন্য' বলছ ত? হয়ত শ্যামদার কোন কোচিং সার্টিফিকেট নেই। নামকরা কোচ নয় ও। কিন্তু একজন সিনিয়র ফুটবলারের একটা সম্মান আছে। সে খেলাটা নিজের জীবন দিয়ে শিখেছে। খাতায়-কলমে যারা বড় তাদের চেয়ে শ্যামদা অনেক বেশি সম্মান পেতে বাধ্য। প্রাপ্য সম্মানটা না দিলে কেউ, সেটা অন্যায় হবে। মনে হয়েছিল শ্যামদার প্রতি অন্যায় হচ্ছে, তাই আমরা সবাই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। বলতে পার, সেজন্যই মনে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সব ছেলে 'শ্যামদার জন্য'।

● শ্যাম থাপা দায়িত্ব নেবার পর তোমাদের খেলার প্রথা-প্রকরণগত বা বিন্যাসে বড় কোন পরিবর্তন হয়েছে কি?

●● না, একই স্টাইলে খেলা চালিয়ে গেছি আমরা।

● নাগজীতে ইস্টবেঙ্গলকে দেখে পি কে বলেছিলেন – এটা কোন দল? যে কন্ডিশনে রেখে এসেছিলাম, এরা তার ধারে কাছে নেই! মন্তব্য?

●● ট্রফি শেষ পর্যন্ত কারা জিতে ছিল? বড় বড় কথা বলে কী লাভ। প্রথমত নাগজী হঠাৎ খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পূজোয় কেউ অনুশীলন করতে পারে নি। মরসুমের শেষদিকে কোন প্রতিযোগিতায় অন্তত সাত থেকে দশদিনের প্রস্তুতি দরকার। তা আমরা পাই নি। দ্বিতীয়ত প্রচন্ড কষ্ট করে ছেলেরা কালিকট পৌঁছয়। মদ্রাজ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘুমতে হয়েছিল। ট্রেন বৃষ্টিতে আটকে যায়। কত অসুবিধে হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। তৃতীয়ত – পৌঁছেই আমাদের পর পর দুটো ম্যাচ দেওয়া হয়।

একটা কথা বলব? ইন্ডিয়ার ছেলেরা ক্যাম্পে যতদিন অনুশীলন করেছে, ততদিন দরকার নেই। মাত্র পনের দিন সময় দেওয়া হক আমাদের। তারপর ম্যাচ হলে ক্যাম্পের ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখে হারাব। হ্যাঁ, প্রতিপক্ষর কোচ যদি পি কেও হন, তবু এ কথাই বলব। শুধু বিবৃতিতে ফুটবল হয় না।

● ছিয়াশির ভাবনাচিন্তা তোমায় অন্তত নতুন করে করতে হবে না। আমার ইঙ্গিতটা নিশ্চয় স্পষ্ট?

●● কোন দিন ভাবি নি, ছিয়াশি নিয়ে আলাদা করে এবার কেন ভাবব? কর্মকর্তারা যোগ্য মনে করলে আমার কাছে আসবেনই। এতদিনে সবাই অবশ্য জেনে গেছেন, মনা মুখে নয়, পায়ে ফুটবল খেলে। সুতরাং কোন পক্ষই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

● আজ (১৯ জানুয়ারি) জেমশেদপুরে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ। কিছু বলবে?

●● সব দেশের চ্যাম্পিয়নরা খেলতে আসছে। আর আমার দলে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার নেই। তাছাড়া যতটা প্রস্তুতি দরকার ছিল, ছেলেরা পায় নি। কী বলব? খুব বেশি কিছু ত আশা করতে পারছি না। একটা কথা বলছি – ছেলেরা ছেড়ে কথা বলবে না। লড়াই করবে, শেষ পর্যন্ত হয়ত খেলার মধ্যে থাকার চেষ্টা করবে। বাস্।

● কর্মকর্তারা খোঁজ না নেওয়ায় আহত বলাই মুখার্জি ক্ষুব্ধ। একটা দৈনিকে ('আজকাল' নয়) দেখলাম এফ ডব্লু এ সম্পর্কেও বলেছে?

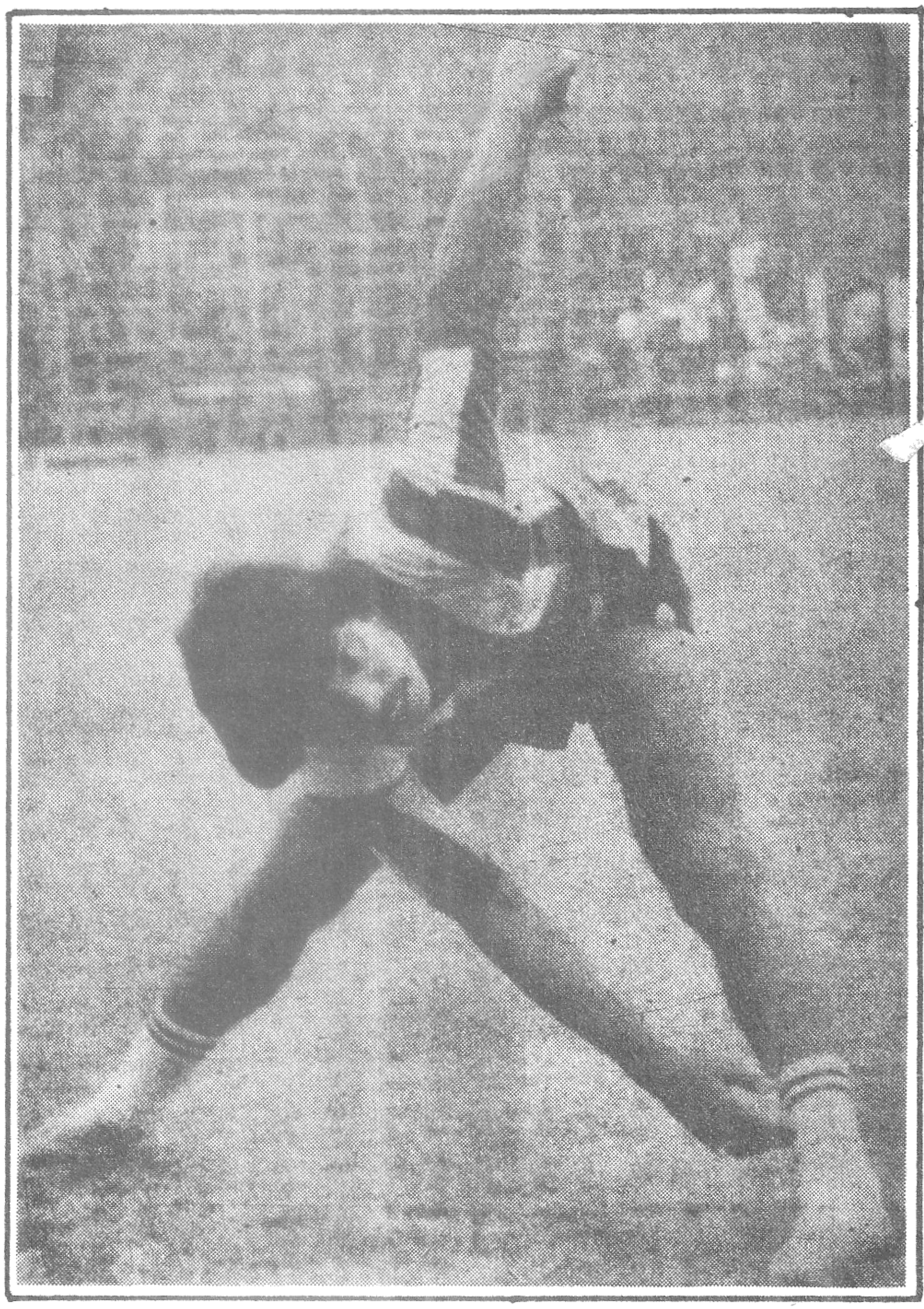
●● ওর ক্ষুব্ধ হওয়ার সংগত কারণ আছে। এটা ত সত্যি, অনেকে ওর সংগে দেখা করে নি। বলাইকে অবশ্য বলেছি কলকাতা ময়দানে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। ওসব বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট নিয়ে দুঃখ পেয়ে লাভ নেই। আমার হাত ভাঙার অভিজ্ঞতা আছে। কে কে পাশে দাঁড়ায় সব জানি।

● আমি ত জানি তুমি, অলোক, ভাস্কর, দেবাশিস রায় এবং আরও কয়েকজন ফুটবলার নিয়মিত বলাইয়ের খোঁজ নিয়েছ। তোমাদের কি এফ ডব্লু এর অংগ হিসেবে ও মনে করতে পারছে না? শুভেচ্ছা জানান বা পাশে দাঁড়ান কি শুধু একতোড়া ফুল পাঠালেই হয়? নৈতিক সমর্থন কি নীরবে জানান যায় না?

●● 'আইডেনটিটি' নিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছে বলাই। হয়ত ও এফ ডব্লু এ বলতে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুভাষ ভৌমিক, অশোক দাশগুপ্ত, শৈলেন মান্না, শান্ত মিত্র বা তুলসীদাস বলরামের কথা মনে মনে ভেবে নিয়েছে। এটা ওর ব্যক্তিগত মতামত। জোর করে হয়ত বদলান সম্ভব নয়।

● এ আই এফ এফ-এর যে সব কর্মকর্তা তোমায় ভারতীয় দলের বাইরে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি সক্রিয়, দেখা গেল বোথুম ম্যাচে তাঁরাই তোমায় মাঠে নামানর জন্য সবচেয়ে উদগ্রীব ছিলেন। কী ধরে নেব? পাইয়ে দেওয়া গোছের ব্যাপার? তোমায় খুশি রাখার চেষ্টা?

●● (একটু রেগে গিয়ে) এ আই এফ এফ আমায় কী পাইয়ে দেবে? ---. কী ---- 'কী----'? একমুঠো টাকা? দরকার নেই। তার চেয়ে মানুষের সম্মান এবং ভালবাসার দাম অনেক বেশি আমার কাছে। নীতির প্রশ্নে, তুমি ত জানই আপোস করতে শিখি নি। ম্যাচ সংগঠক ছিল টাটা। তাদের অনুরোধে খেলেছি। আই এফ এ একাদশ মানে ত বাংলা দল। তার জন্য উজাড় করে দেব। জামশেদপুর গিয়েছিলাম টাটার নিমন্ত্রণে। এ আই



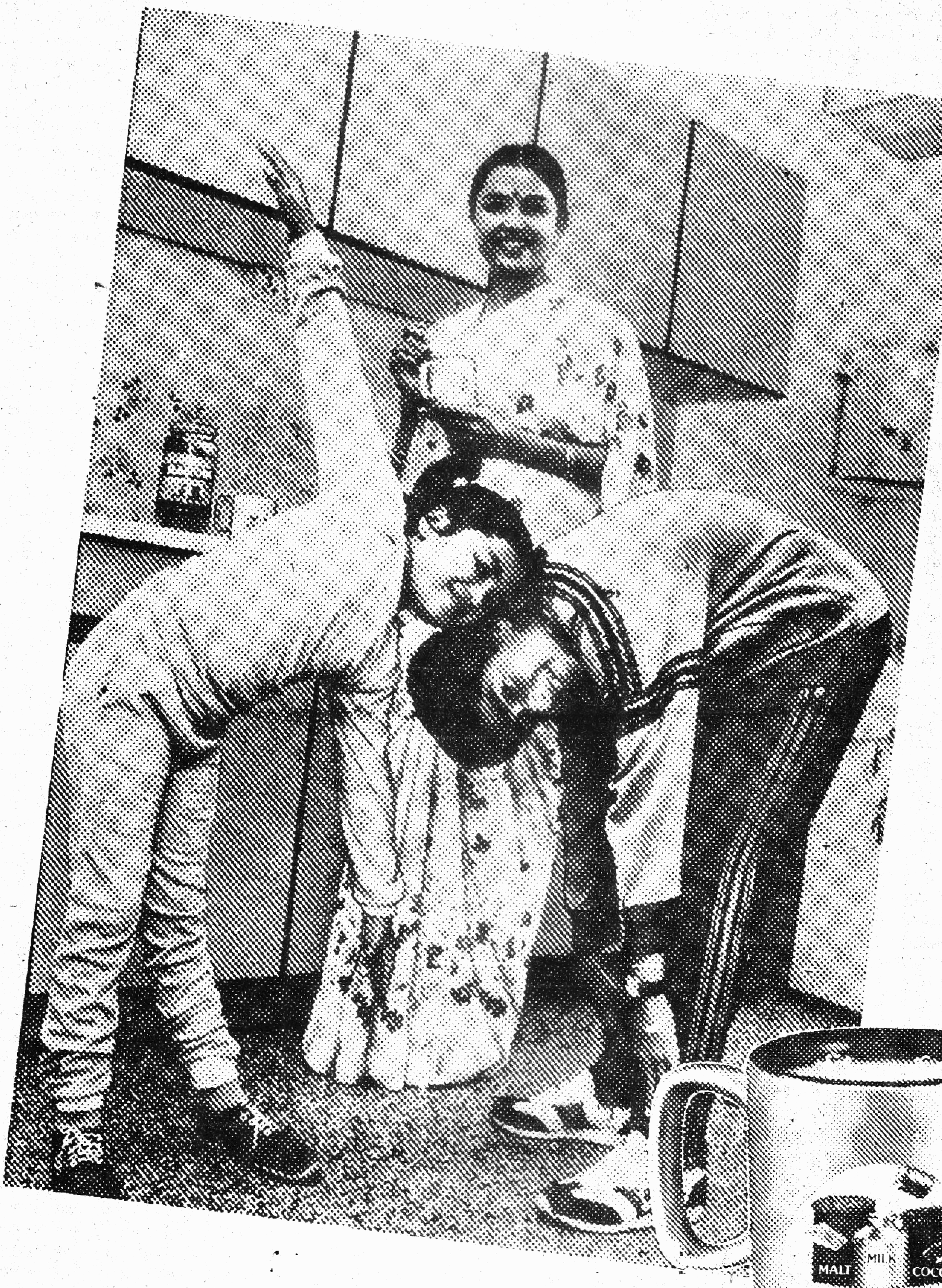
ছবি : দিলীপ সাহা

আমি না থাকলে টুলু স্টপারে চলে এসেছে। এতে মাঝমাঠে স্ন্যাচিং টাকলিং এবং গেম তৈরির 'স্পেডওয়ার্ক' বন্ধ হয়ে গেছে।



বলাইকে অবশ্য বলেছি কলকাতা ময়দানে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। ও-সব বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট নিয়ে দুঃখ পেয়ে লাভ নেই।

পুরস্কার জয়ী সোনামণির মা যে মলটোভা মামণি !



মলটোভা মামণি...
বুদ্ধি-বিবেচনায়, মমতায়-যত্নে
এক একটি সোনার খনি ।
কারণ, এইসব মায়েরা জানেন যে
প্রতি চামচ ভরা মলটোভায় আছে
সোনালী দানার গম, মুক্তোর
মত বার্লি,
খাঁটি দুধ,
ঘন বাদামী
কোকো আর



শক্তি যোগানের চিনির অশেষ গুণ
ভরা। কাপ ভরা দুধে মলটোভা
গুলে সোনামণিকে খাওয়ানো মানে,
প্রাণের স্ফূর্তিতে সবেতেই মলটোভা
সোনামণি সোনা জয় করে আনে ।



নতুন
মলটোভা®

স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের মিলিত যোগে বিজয়ী সবার আগে !

FSA/JIL 3/85 BEN



ছবি : বিকাশ সাহা

এফ এফ থেকে একটা অনুরোধ বা শব্দ ছুঁড়ে দিলেই যেতাম না।

● 'মনা-সুব্রত' জুটি কেমন খেলে মাঠে এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শক আসার এটাও অন্যতম কারণ?

●● হতে পারে। ম্যাচটা কিন্তু খেলার মত কন্ডিশনে একদম ছিলাম না। শান্ত মিত্রকে বলেছিলাম – পায়ে চোট রয়েছে। নামাবেন না। শানুদা কথা শোনেন নি। বলেন – তুই আর বাবলু শুরু কর। অনেকে এটা সেলিং পয়েন্ট বলে মনে করছে। পরে তরুণকে পাঠাব। আমি পুরো ফিট থাকলেও তরুণকে নামান উচিত ছিল প্রথম থেকেই। ও দ্রুত উঠে আসছে। সন্দেহ নেই সেরা ফর্মে রয়েছে। ওরই সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। রেজা' কি হত বলতে পারি না, তবে লড়াই বেশি হত নিশ্চয়।

● ন্যাশনালে আবার সবাইকে একসঙ্গে ডেকেছেন অমলদা। কী ভাবছ?

●● আমার ভাবা না ভাবায় কিছু যায় আসে কি? অমলদা যেটা ভাববেন সেটাই ফাইনাল তবে তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন দায়িত্ব দিলে বাংলার জন্য মনোরঞ্জন এখনও নিজেকে নিংড়ে দেবে

● পঁচাশিতে মোহনবাগান, মহমেডান বা পাঞ্জাব ও গোয়ার দল সেভাবে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরেছে?

●● না। সত্যি এ বছর সেভাবে কেউ আমাদের বিপদে ফেলতে পারে নি। দুয়েকটা ম্যাচ বিক্ষিপ্তভাবে হারতেই পারে যে কোন দল।

● স্বীকৃত বিশেষজ্ঞরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। চুনী গোস্বামী, অমল দত্ত, সুভাষ ভৌমিক ?

●● কেন বলছেন জানি না। হয়ত ওঁদের বিশ্লেষণ অন্যরকম। কিন্তু আমরা নিজেদের ফুটবলবোধ দিয়ে অন্য রকম বুঝেছি।

● পঁচাশির নবতম সংযোজন – ডিফেন্সের চিমা-ভীতি। কিছু বলবে?

●● না এবং না। আর একটু দেখই না।

● চুনী গোস্বামী মোহনবাগানের ফুটবল সচিব হওয়ার পরই বলেছিলেন ডিফেন্সে একটা শক্ত খুঁটি চাই। গতবার তোমার কাছেও মোহনবাগান প্রায় অবিশ্বাস্য অফার নিয়ে এসেছিল। ময়দানে কিন্তু সবাই জেনে গেছেন মনার গায়ে লাল-হলুদ জার্সি ছাড়া কিছু মানায় না। তবু কেন ---- ?

●● ইস্টবেংগল আমায় রাখবেই এখন থেকে রটিয়ে দিচ্ছ কেন? দর কমে যাবে!

● রসিকতা করছ? অন্য প্রশ্নে আসছি। আর বোধহয় দেশের হয়ে খেলার কথা ভাব না?

●● এবার বোধহয় তুমি রসিকতা করা শুরু করলে। এখন আর এসব প্রশ্ন তুলে কী লাভ।

● বাংলায় নতুন কোন ছেলে উঠে আসছে?

●● বলতে পারব না। ম্যাচের দিন আর প্র্যাকটিসে মাঠে যাওয়া ছাড়া ক্রমশ সম্পর্কের সুতো সরু হচ্ছে। অন্যের কথা শুনে কারও সম্পর্কে বলা উচিত নয়। আমার চোখে যে কটা ছেলে পড়েছে, তাদের সীমাবদ্ধতার তালিকা দীর্ঘ। এখনই এসব বলে দিয়ে ওদের হতাশ করতে চাই না।

● মনা, মাঠে মেজাজ ঠান্ডা না রাখতে পারার ঘটনা এবারও ঘটল? 'ব্যাড বয়' ইমেজটা কীভাবে কাটাবে?

●● বিশ্বাস কর, লীগে মাত্র একটি ঘটনায় জড়িয়ে যাই। এখনও বলছি, সেটা আমার জীবনের কলঙ্ক। অনেকেই কিন্তু জানল না, ছেলেটা বহুক্ষণ ধরে আমায় খোঁচানর চেষ্টা করছিল। ও প্রথমে লাথি মারে। কিন্তু মেনে নিচ্ছি এক্ষেত্রে আমার মাথা ঠান্ডা না রাখতে পারার চেয়ে বড় অন্যায় আর হয় না। এজন্য সারাজীবন অনুশোচনায় ভুগব।

এবার যা বলছি লিখবে কি? 'খেলা'-য় দুটো রিপোর্ট লিখেছিল সরোজ চক্রবর্তী। নাগজীতে নাকি আমি আর তরুণ মাঠের বাইরে বসা শ্যামদার দিকে গালাগালি করি। একথা ঠিক নয়। ভাল না লাগলে বা সিনিয়ররা অন্যায় করছে দেখলে আমি সাধারণত এড়িয়ে যাই। সে ব্যক্তিকে মুখোমুখি যাতে না হতে হয় সে চেষ্টা করি। কিন্তু কখনও অসম্মান করি না। পি কে ত পরে অনেক বিবৃতি দিয়েছেন। কখনও তাঁর মুখের ওপর কিছু বলেছি?

দার্জিলিং গোল্ড কাপের ফাইনালের রিপোর্টে বলা হয় – আমি নাকি সাবিরের দিকে এমনভাবে তেড়ে যাই মাঠে বড় ধরনের গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়তে পারত। হ্যাঁ, তেড়ে আমি যাই ঠিকই কিন্তু সাবিরকে মারার জন্য নয়। ওকে বলেছিলাম – এভাবে পা চালানর কি দরকার ছিল যাতে একটা ছেলের সিনবোন ভেঙে টুকরো হয়ে যায়? বুঝতে পারছিলাম বলাইয়ের হাড় ভেঙেছে, ওর জীবনে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেল। বরং সাবির এতে উল্টে তেড়ে এসে হাত চালানর চেষ্টা করে। এখন ভাবছি ব্যাড-বয় ইমেজ থাকলে বারবার তাতে কালি ছেটান হয়।

● আগাম অভিনন্দন, বিয়ের জন্য।

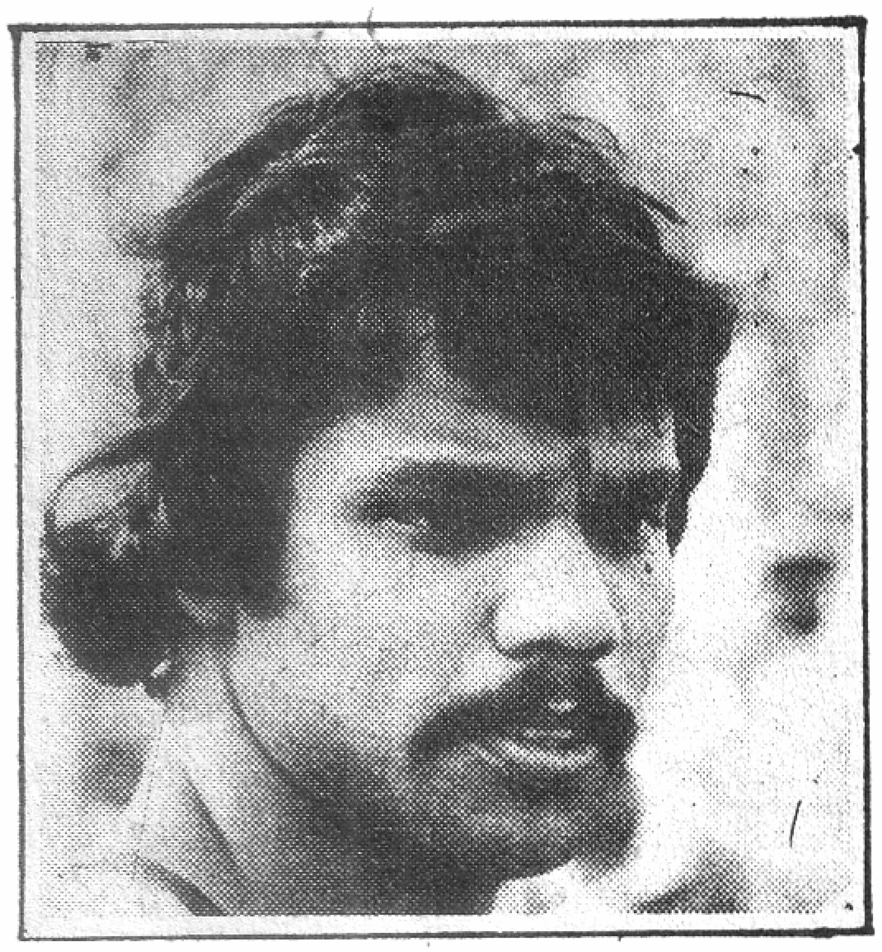
●● কয়েকমাস পরেই করতাম জেন্ডা যাওয়া হল না দেখে জানুয়ারিতেই করে ফেলছি। ১ ফেব্রুয়ারি বৌভাত।

● এ ব্যাপারে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় ক্রিকেটারদের মত। প্রতিষ্ঠার শক্ত সোপানে না দাঁড়িয়ে গার্হস্থ্য সুখের দায়িত্ব কেউ নেয় না।

●● বাঙালী মধ্যবিত্ত ছেলেরা একটু পরের দিকেই বিয়ে করে। আমার সিদ্ধান্ত অন্য কোন কারণে নিতে দেরি হয় নি। একটু সংগঠিত হতেই হয়।

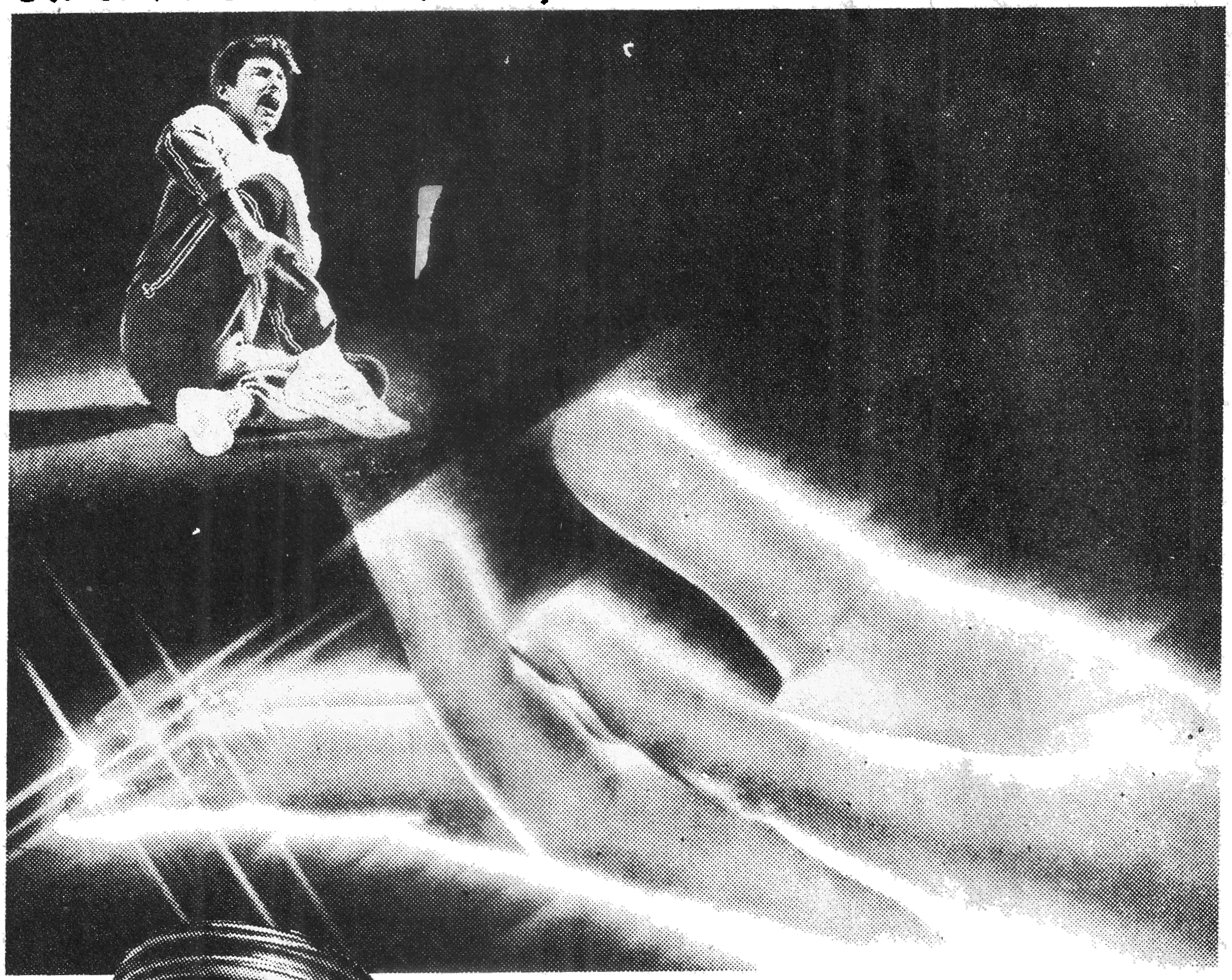
● শেষ প্রশ্ন। হাঁটুতে কি অস্ত্রোপচার করতে হবে মনে হচ্ছে?

●● না, না। বিশ্রাম এবং 'গ্রেডেড এক্সারসাইজ' আবার আমায় অ্যাকশনে ফিরিয়ে আনবে। ডাক্তাররা তাই বলেছেন। শুধু সবার শুভেচ্ছা চাই।



১৯৭৭ থেকে ইস্টবেংগলে খেলছি। এত ভাল দল জীবনে পাই নি। এত ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফরমেন্সও হয় নি।

পেশী খিঁচ ধরার চোটে
ওঁর প্র্যাকটিশ কি বরবাদ ?





ব্যথা উপশমের গুণ তো আপনার হাতেই !

আপনার দরদী হাতের পরশ আর আয়োডেক্সের ব্যথা উপশমের শক্তির চমৎকার – ওঁর দুই-ই দরকার। তাই, আয়োডেক্স সবসময়ে হাতের নাগালেই রাখুন, কারণ, আয়োডেক্সে আছে আয়োডিনের গুণ, যা জখম টিস্যুকে সারিয়ে তোলে, আর আছে মিথাইল স্যালিসিলেট, যা ব্যথা-বেদনার জড়কে নির্মূল করে

আয়োডেক্স লাগালে দিনে দু'বার দু'গুণ কাজে চমৎকার

ডাক্তারদের মতে ব্যথা-বেদনা পুরো কমে না যাওয়া পর্যন্ত আয়োডেক্স লাগানো উচিৎ দিনে দু'বার এবং ব্যথা কমার পরেও আরো কয়েক দিন। ব্যথা হ'ল উপসর্গ মাত্র, বেদনার আসল কারণ হ'ল জখম টিস্যু।

সুতরাং আপনার প্রিয়জন যখনই পেশীর খিঁচ ধরা, মচকানি, গাঁটের আড়ষ্টতা বা দেহের ব্যথা-বেদনার চোটে কষ্ট পাবেন, তখন-ই আপনার হাতের পরশে, আলতো মালিশে আয়োডেক্স লাগান – দিনে দু'বার আর ওরা কেমন দু'গুণ চটপট সেরে চাঙ্গা হয় আর আপনার দরদী হাতের গুণ গায়

আয়োডেক্স® – ব্যথা উপশমের গুণের শক্তিতে ভরপুর খাস বাম

SKOF – এক এস কে এফ উৎপাদন

অরুণলাল ম্যান অফ দি ম্যাচ

বাংলার বোলাররা হতাশ করলেন

রৌরকেলা থেকে/দেবাশিস দত্ত

আসামকে অপ্রত্যাশিতভাবে সরাসরি হারানর পরই বাংলা শিবিরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। পরম অনিশ্চয়তায় ভরা ক্রিকেট আপন বৈশিষ্ঠ নিয়ে রঞ্জি ট্রফির এই আসরে ইডেনে সশরীরে উপস্থিত মুহূর্তে আনন্দের স্রোতে গা ভাসানর সংগে সংগে অধিনায়ক অরুণলাল তাঁর সহ খেলোয়াড়দের একথা মনে করিয়ে দিতে কোন ভুল করেন নি যে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য পরের ম্যাচগুলিতে নিজের সেরা খেলা মেলে ধরতে হবে। রৌরকেল্লা যাওয়ার আগে বাংলার অধিনায়ক অরুণলাল বলেছিলেন, "ওড়িশায় আমাদের প্রথম লক্ষ্য থাকবে যত বেশি সম্ভব বোনাস পয়েন্ট সংগ্রহ করা। আমরা আপাতত এক পয়েন্টে পিছিয়ে আছি ওড়িশার থেকে। আশা করি, অনুপ্রাণিত বাংলা দলের ক্রিকেটাররা নিজেদের উজার করে দেবে।"
আঠার ঘন্টার মধ্যে দশ ঘন্টা সময় কেড়ে নিয়েছিল প্রকৃতি। ১৫ জানুয়ারি ইস্পাত স্টেডিয়ামে পৌছে দেখি দুই দলের ক্রিকেটাররা ঠান্ডায় হাত গুটিয়ে বসে আছেন। দুই আম্পায়ার কোটের পকেটে হাত দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন। বৃষ্টি, কুয়াশা – সব মিলিয়ে এক প্রতিকূল পরিস্থিতি। চা পানের বিরতির কিছুক্ষণ আগে দুই আম্পায়ার দন্ডপানিয়ান (তামিলনাড়ু) এবং রাঘবেন্দ্র (কর্ণাটক) জানিয়ে দেন যে প্রথম দিনের মত খেলা বাতিল হয়ে গেল। মাঠের মাঝে গিয়ে দেখি চমৎকার আউটফিল্ড বৃষ্টিস্নাত হয়ে আছে। পিচ পলিথিনের শিট দিয়ে ঢাকা। সংগঠকদের দূরদৃষ্টি দেখে একটু অবাকই হলাম। আগের দিনের ঝলমলে আবহাওয়ার জন্য পিচে ঠিকমত ঢেকে রাখার ব্যাপারে সংগঠকরা বিশেষ উদ্যোগ নেন নি। ফলে, পরেরদিন সকালেও নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শুরু করতে পারেন নি আম্পায়াররা। দ্বিতীয় দিন খেলা শুরু হয় দুপুর একটা পনের মিনিটে। ওড়িশার অধিনায়ক করণ দুবে টসে জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রণব রায় এবং মিন্টু দাস ওপেন করতে এসেছিলেন। ভারি আবহাওয়া এবং ভিজে উইকেটের শিকার হন মিন্টু। অধিনায়ক অরুণলাল এবং প্রণব রায় শুরু থেকেই স্কোরবোর্ডকে সচল করার দিকে নজর দিয়েছিলেন। বাংলা দল ১৫২ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে একটি বোনাস পয়েন্ট তুলে নেয়। জবাবে দিনের শেষে ওড়িশা কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৭ রান তোলে।

তৃতীয় দিনও প্রকৃতি খেলার উপর থাবা বসিয়ে নব্বই মিনিট সময় কেড়ে নেয়। মন্দ আলো এবং কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য তৃতীয় দিন ম্যাচ শুরু হয় নব্বই মিনিট পরে। ওড়িশার দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান করণ দুবে (৫৬) এবং প্রীতম দাস (৪৭) প্রথম উইকেটে ১০৯ রান যোগ করেন। প্রীতমের ব্যাটিং ভাল লাগল। সতের বছরের এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওড়িশার ব্যাটসম্যানেরা প্রমাণ করলেন যে ওঁরা খুব দ্রুত উন্নতি করছেন। ৬ উইকেটে ২৫০ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন ওড়িশার অধিনায়ক করণ দুবে। দেড়শ, দুশ এবং আড়াইশ রানের সীমানা অতিক্রম করার সংগেসংগে ওড়িশার ভান্ডারে জমা পড়ে তিনটি বোনাস পয়েন্ট। বাংলার বোলাররা ওড়িশাকে ছিঁড়ে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে অমীমাংসিত ম্যাচে বাংলা তিনটি বেশি বোনাস পয়েন্ট পায় নি। করণ যখন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, তখন ম্যাচ মরে গেছে। শেষ ৯ ওভারে বাংলার দুই ওপেনার প্রণব রায় (৫) এবং অভীক মিত্র (৫) ১৩ রান করেন। অর্থাৎ যে জায়গা থেকে ম্যাচ শুরু করেছিল, তিন দিন পরেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় নি। ব্যবধান একই থেকে গেছে। বাংলার পরের ম্যাচ রাঁচিতে বিহারের বিপক্ষে। বাংলার আপাতত সংগ্রহ তেষট্টি পয়েন্ট। ওড়িশার চোষট্টি। ম্যান অফ দি ম্যাচ হিসাবে নির্বাচিত হন অরুণলাল ওঁর প্রথম ইনিংসের অপরাজিত ৬৩ রানের জন্য। ম্যাচের সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হন করণ দুবে। দুজনের হাতেই পুরস্কার হিসাবে পাঁচশ এক টাকা করে তুলে দেন ওড়িশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিভূতি দাস।

এই মরসুমে বাংলা এ পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলল। পরিস্থিতি যা তাতে বাংলাকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরের ম্যাচে বিহারকে সরাসরি হারতে হবে। নিজেদের প্রমাণ করার শেষ সুযোগ পাচ্ছেন বাংলার ক্রিকেটাররা বিহারের বিপক্ষে। বোলিং, ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং তিনটি বিভাগেই বাংলার ক্রিকেটারদের দক্ষতার শীর্ষে পৌছতে হবে। আমরা আশায় থাকলাম।

স্কোর : –

বাংলা প্রথম ইনিংস

প্রণব রায় রান আউট	৩৬
মিন্টু দাস ক স্বপন মিত্র ব পবন আগরওয়াল	০০
অরুণলাল অপরাজিত	৬৩
অভীক মিত্র অপরাজিত	৩০
অতিরিক্ত	০৭
মোট	১৩৬

উইকেট পতন ১/৪, ২/৭৪

:– বোলিং

প্রহরাজ	১০	৩	৩৩	০
আগরওয়াল	৪	০	২২	১
মহাপাত্র	২	০	২২ -	০
স্বপন মিত্র	৪	০ -	২৭ -	০
দেবাশিস মহান্তি	২	০ -	১৫	০
খাটুয়া	২	০	১৫ -	০

ওড়িশা প্রথম ইনিংস

করণ দুবে ব অরূপ ভট্টাচার্য	৫৬
প্রীতম দাস ক রাজেশ দানি ব অরূপ ভট্টাচার্য	৪৭
আসজিৎ জয়প্রকাশ স্টা: মিন্টু দাস ব উৎপল চ্যাটার্জি	০১
দেবাশিস মহান্তি ক ও ব উৎপল চ্যাটার্জি	০৫
স্বপন মিত্র ক গৌতম সোম(জুনিয়র) ব প্রণব নন্দী	৩১
অনিল ভরদ্বাজ অপরাজিত	৪৫
প্রহরাজ এল বি ডব্লু গৌতম সোম(জুনিয়র)	৩৭
অবিনাশ খাটুয়া অপরাজিত	০৮
অতিরিক্ত	২০
মোট (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)	২৫০

উইকেট পতন :– ১/১০৯, ২/১১২, ৩/১১২, ৪/১৩৬, ৫/১৫৭, ৬/২৩০

:– বোলিং :–

গৌতম সোম (জুনিয়র)	১২	২	৪১	১
গৌতম সোম (সিনিয়র)	৭ -	০	১৫	০
উৎপল চ্যাটার্জি	১৯ -	৩ -	৫৪	২
সৃজন মুখার্জি	৭	০ -	২৫	০
অরূপ ভট্টাচার্য	২৮ -	৪	৪ ৮৩	২
অরুণলাল	২	০ -	৪ -	০
প্রণব নন্দী	৫	০	১৮	১

বাংলা দ্বিতীয় ইনিংস

প্রণব রায় অপরাজিত		০৫
অভীক মিত্র অপরাজিত		০৫
অতিরিক্ত		০৩
মোট	বিনা উইকেটে	১৩

:– বোলিং :–

প্রহরাজ	২	১	২	০
আগরওয়াল	১	০ -	১ -	০
দেবাশিস মহান্তি	২ -	০	৩ -	০
আসজিৎ জয়প্রকাশ	২	১ -	৬	০
সৌরজিৎ মহাপাত্র	১ -	০ -	১	০
করণ দুবে	১	১ -	০	০

●●
●●

বাংলার ক্রিকেটে অরুণলাল আশীর্বাদ

পলাশ নন্দী

বাংলার ক্রিকেটে যখন আকাল, চতুর্দিকে যখন খরা চলছে, অরুণলাল তখন মৌসুমী বাতাস, হঠাৎ ছুটে আসে বৃষ্টির মত।

ভারতীয় ক্রিকেটে আমরা কখনই সেভাবে রাজত্ব করিনি একথা ঠিক, তবু একটা সময়ে একেবারে উপেক্ষা করার মত শক্তি ছিলাম না আমরা, আর পূর্বাঞ্চলে ত আমরাই ছিলাম সেরা।

আর গত কয়েকবছর ধরে ঘরে বসে মার খাচ্ছি। তবু আমাদের হুঁস নেই।

কয়েকদিন আগে গোপালদার (বসু) সংগে কথা হচ্ছিল, বলছিলেন, 'দেখ, ওড়িশা, বিহার, এমনকি আসাম যে ক্রিকেটে উন্নতি করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাশাপাশি এটাও ঠিক আমাদের মান যেখানে ছিল, সেখানে আর নেই, নেমে গেছে।'

গোপালদার কথার প্রতিবাদ করতে পারি নি। করব কীকরে, এটা ত ঠিক এখন কিংবা সাম্প্রতিক অতীতে আমরা লোকাল ক্রিকেটে কয়েকটা সেঞ্চুরি, কয়েকটা হ্যাটট্রিকেই সন্তুষ্ট থাকতে শুরু করেছি। এর থেকে বেশি করার আমাদের যেন ক্ষমতা নেই। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা, বা উচ্চাশাই এই অভাব, আমাদের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার অসংখ্য ক্রিকেটার, কর্মকর্তা, একাধিক প্রশিক্ষক এই অভিশাপ থেকে বাংলার ক্রিকেটকে মুক্তি দিতে সায় ছিল না। একা অরুণলাল এই অভিশাপ থেকে বাংলায় ক্রিকেটকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ও সফল হবেই। অরুণলাল বাংলার ক্রিকেটে আশীর্বাদ।

উনআশি-আশিতে অরুণলাল দিল্লির হয়ে কলকাতায় এসেছিল বাংলার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে। তখনই আমি ওকে প্রথম দেখি। পঁচাত্তর রানের একটি দর্শনীয় ইনিংস খেলেছিল। প্রথম দর্শনেই ওকে আমার টেস্ট কোয়ালিটি বলে মনে হয়েছিল।

তখনই ও দক্ষ ব্যাটসম্যান বা ফিল্ডার বলে নয়, ও আমার নজর কেড়েছিল আন্তরিকতার জন্য, প্রতিদিন ম্যাচের আগে দেখতাম বেশ কিছুক্ষণ অনুশীলন করত – শরীর চর্চা, ব্যাটিং অনুশীলন।

সেদিন কিন্তু ভাবিনি পরে ও আমারই কাছাকাছি দীর্ঘদিন থেকে যাবে। কি করে ভাবব, ওর মত প্রতিভাধর ও 'সিরিয়াস' ছেলে বাংলার ক্রিকেটে।

যা হ'ক চাকরি সূত্রে ও কলকাতায় এল একাশি-বিরাশিতে। আর সেদিন থেকেই আমরা একই সংগে, একই দলে(মোহনবাগানে)। স্বাভাবিক কারণেই ওকে আরও কাছ থেকে দেখার বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

ওর মত 'সিরিয়াস' ক্রিকেটার বাংলায় ত নেইই, ভারতেও বেশি আছে কিনা সন্দেহ।

ও প্রতিটি ম্যাচকে সমান গুরুত্ব দেয়। লোকাল ক্রিকেটে কোন দুর্বল দলের বিরুদ্ধে ও যতটা সিরিয়াস, ততটাই সিরিয়াস, রঞ্জি ট্রফি এমনকি জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সময়েও।

ক্লাব ক্রিকেটেও ম্যাচ শুরু হওয়ার অনেক আগেও দেখি মাঠে এসে অনুশীলন করছে।

ও একটি চা কোম্পানীতে উচ্চপদে কাজ করে। অনুশীলনের সময়ে ও কখনও দেরিতে আসে না। কিন্তু এসেই দেখেছি দুই মিনিটের জন্যও বিশ্রাম নেয় না। একটাসিগারেট কিম্বা এক কাপ চা খাওয়ার জন্য দাঁড়ায় না। কারও সংগে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে না। একটানা দুই ঘণ্টা অনুশীলন করে যায়। কখনও শরীর চর্চা, কখনও ক্যাচ ধরা, কখনও ব্যাটিং আবার কখনও বল হাতে অপরকে অনুশীলনে সাহায্য করছে।

আমার ক্রিকেট জীবনে অনুশীলনের সময়ে ওর সব 'সিরিয়াস' আরও কয়েকজনকে দেখেছি। কিন্তু তাদের সংগে ওর পার্থক্য

ও শুধু নিজে অনুশীলন করে না, কাছাকাছি যারা থাকে তাদেরও নিবিড় অনুশীলনে বাধ্য করে। কাউকে এইটুকু ফাঁকি দিতে দেখলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। অনুশীলনে গাফিলতি দেখলে কাউকে তিরস্কার করছে, আবার নিজে হাতে কারুর ভুল ত্রুটি শুধরে দিয়েছে। বাংলার প্রতিটি তরুণ ক্রিকেটারের কাছে অরুণলাল আর্দশ হওয়া উচিত।

আফশোস হয়, আরও চারপাঁচ বছর আগে অরুণলাল এলে বাংলার ক্রিকেট অনেক বেশি উপকৃত হত।

কোন ব্যাটসম্যান তিরিশ করলেই ও তাকে বোঝাতে থাকে, অনুপ্রাণিত করতে থাকে, আর একটু চেষ্টা করলেই তুমি সেঞ্চুরি পেয়ে যাবে।

দল যখন বিপদে পড়ে, অল্প রানে চার পাঁচটা উইকেট পড়ে যায়, তখন ওর সামনে যাওয়া যায় না। যারা ব্যর্থ তাদের ওযা বলে, তাতে তাদের টগবগ করে ফোটার কথা। পরবর্তী ইনিংসে কিছুতেই তারা যাতে ব্যর্থ না হয়, এমন ক্রোধ, জেদ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে। আর সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তে যারা ব্যাট করতে যাচ্ছে, তাদের প্যাড পরিয়ে দেয়, দরকারে হয় ত জুতোও পরিয়ে দেয়। বোঝায়, এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ, জীবনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার, চেষ্টা কর, তুই আজ রেকর্ড করবি।

আমি ছোট, বড় অনেক ক্রিকেটারকে দেখেছি, নিজের ব্যাট(বিশেষ করে তা যদি বিদেশী হয়) কাউকে দিতে চায় না। ওর কাছে কিন্তু চাইতে হয় না। নিজেই বলে, তুই আমার ব্যাট নে না। ব্যাট করতে সুবিধা। এমন কি নিজের গ্লাবসও খুলে দেয়।

কতদিন বলেছে, ভাল ব্যাট কেনার মত টাকা কোথায় ওর। কি আছে আমার ব্যাটটা ব্যবহার করে ও যদি কিছু রান পায় ব্যাটটা নষ্ট হয়ে যাবে?

এই ত সেদিনও বাংলার অনুশীলনের শেষে খেলোয়াড়রা যখন খাচ্ছে, একজনের প্লেটে ময়লা দেখে চেঁচিয়ে উঠল। কর্তৃপক্ষকে বলল, এরপর থেকে এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যেন এ ধরনের গাফিলতি না হয়। অনুশীলনের জন্য উইকেট ঠিক মত প্রস্তুত নয় ও নিজেই গেল কর্তৃপক্ষের সংগে ঝগড়া করতে।

ক্লাবে আমার সংগে মাঝে মাঝে অন্যমাঠে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে, কাউকে নজরে পড়লে আলোচনা করে। একদিন বলছিল, 'এখানকার জুনিয়র ছেলেদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পায় না। চল না, সিনিয়র ক্রিকেটাররা চাঁদা দিয়ে একটা ফাণ্ড করি, প্রতিভাধর জুনিয়র ছেলেদের সরঞ্জাম কিনে দেব।'

বাংলার পারফরমেন্স ভাল করার জন্য ও উঠেপড়ে লেগেছে, গতবারই বলছিল, 'তুমি অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার কর। বাংলার দলে ক্রিকেটে এখনও তোমাকে প্রয়োজন'।

বাংলার ক্রিকেটের উন্নতিতে ও ওপেন ক্রিকেট চালু করার পক্ষপাতি। ক্রিকেটাররা এখানে ক্লাব ক্রিকেটে অংশ নিতে আসবে। রঞ্জিট্রফিতে আবার তারা নিজের রাজ্যের হয়ে খেলবে। ওর ধারণা তাতে এখানকার মান উন্নতি হবে।

যে ছেলেটা বাংলার ক্রিকেটের জন্য এতভাবে, সে বাংলার অধিনায়ক হওয়ায় কেউ কেউ এদিক ওদিক অন্যরকম বলে বেড়াচ্ছেন অপরাধ, ও অবাঙালী। আশ্চর্য এদের চরিত্র।

অরুণলাল অবশ্য এ সবে কান দেয় না। বলে, 'যাদের যা স্বভাব তারা ত তা করবেই' ওদের কাজ সবকিছুর মধ্যেই খারাপ দেখা। আর আমার কাজ ক্রিকেট খেলা। ওসবে কান দিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না'।

কেউ কেউ অভিযোগ করে বাংলার ক্রিকেট দল এখন অরুণলালই গঠন করে। নির্বাচকরা শুধু নামে আছে নাকি। অভিযোগকারীরা ভেবে দেখে না একবারও, সবদেশে সব সময়েই ক্রিকেট দল গঠনে অধিনায়ক তার মতামত জানায়। অরুণলালও তা জানিয়ে যদি থাকে অন্যায়টা কোথায়। যা করেছে তা ত বাংলার ভালর জন্যই। এর জন্য ত কোন যোগ্য খেলোয়াড় বাংলা দল থেকে বাদ পড়েনি। বিপক্ষের বোলিং শক্তি যত শক্তিশালীই হ'ক না কেন! ওর একটাই কথা, উসকো ফাঁড় দো'।

অরুণলাল এখন দক্ষতার শীর্ষে। তিনটে ম্যাচে এক'শর ওপর গড়। ভারতীয় টেস্ট দলে ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

যে কোন জায়গায় ও ভারতের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। আর ব্যাটসম্যান? টেস্ট ক্রিকেটে ওকে তেমনভাবে সুযোগ দেওয়া হল কই?

●●

পৃথিবীর কোথাও কলকাতার মত ক্রিকেট খেলা হয় না: অরুণলাল

অলক চট্টোপাধ্যায়



ছবি: বিকাশ সাহু

দম বন্ধ হয়ে আসা পরিবেশ, অনেকটা বন্ধঘরের মত, কলকাতার ক্রিকেটে এখন মরুভূমির হাতছানি। ভারতীয় দর্শনের উদাসীন মানসিকতার বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র যেন। পুরোন অভ্যাস অনুযায়ী লীগ-নক আউট-জে সি মুখার্জি-রনজি সবই গড্ডালিকা প্রবাহে চলছে। এই প্রাণহীন পৌনপুনিকতায় আবদ্ধ পরিস্থিতিতে গত ১২ জানুয়ারি যেন হঠাৎই দমকা ঝড়ে বন্ধ ঘরের জানলা খুলে গেছে, বন্ধ ঘরের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর প্রাণের স্পর্শ এনে দিয়েছে একজন ক্রিকেটারের প্রত্যয়, উৎসাহ এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব। অধিনায়ক অরুণলাল বাংলার তরুণ দলের মধ্যে যে আবেগ ও উৎসাহের সঞ্চার করেছেন তাতে এক্ষুনি যদি অসাধারণ সাফল্য নাও পাওয়া যায় তাহলেও ভবিষ্যতের জন্য এমন উৎসাহ ও আক্রমণাত্মক পথেই চলতে হবে। আসামের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় জয় অধিনায়ক অরুণলালকে উৎসাহিত করেছে, বাংলার ক্রিকেটের অভিভাবকদের ঘুম ভাঙবে?

আসামের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের দল যেভাবে বোলিং ও ফিল্ডিং করেছে তার প্রশংসা করতেই হবে। প্রথম ইনিংসেও বল বহুবার ব্যাটকে পরাজিত করলেও ক্যাচগুলি হাতে আসে নি, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা সরাসরি ক্যাচগুলি পেয়ে গেছি। ভাগ্যও আমাদের সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। চা বিরতির আগে শেষ ওভার চলছে মাত্র দুটি বল বাকি, সেই সময় মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম যদি এখন উইকেট পড়ে যায় তাহলে চা-বিরতির সময় পিছিয়ে যাবে এবং দুটি ইনিংসের মাঝখানের সময়ও বেঁচে যায়। প্রত্যাশাপূর্ণ করে আসামের একজন ব্যাটসম্যান সেই বলেই রান আউট হল। আসাম প্রথম দিকে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাতে পারে নি, কয়েকটি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ওরা আর চাপ সামলাতে পারে নি। জেতার পর আমাদের দলের ছেলেদের মধ্যে হারান আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে, আসামের বিরুদ্ধে না জিততে পারলে মানসিক অবস্থার দিক থেকে আমরা নিশ্চয় খুব ভাল অবস্থায় থাকতাম না।

● এই মুহূর্তে বাংলার অধিনায়ক হিসাবে আপনার মনের অবস্থা কেমন?

অরুণলাল:– এই মুহূর্তে আমি পৃথিবীর ছাদে বসে আছি। আমার হাতে একটা ভাল দল রয়েছে, তারা শুনতে এবং শিখতে আগ্রহী। আসাম ম্যাচের পর বাংলার ক্রিকেটাররা তাদের নিজেদের যোগ্যতা আবিষ্কার করতে পেরেছে, আমি বিশ্বাস করি এই ক্রিকেটাররা এখন তাদের সেরা দক্ষতা উজাড় করে দেবে।

● আপনি কি ঠিক উপযুক্ত সময়ে বাংলা দলের নেতৃত্বের ভার পেয়েছেন বলে মনে করেন? বাংলার এর আগের অধিনায়কদের কৌশল সম্পর্কে মন্তব্য করবেন?

অরুণলাল:– আমার কাছে যে কোন সময়ই সুসময়, আমি চাইছি আমাদের দল এতদিন যেমনভাবে খেলেছে তার চেয়ে আর একটু বেশি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলুক। আমি দীর্ঘদিন বাংলার পক্ষে খেলছি না, তবে অধিনায়ক হিসাবে দোশিও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে চেষ্টা করেছে, দিলীপ সত্যিই দারুণ লড়াকু ক্রিকেটার।

● কলকাতার ক্রিকেটের বর্তমান পরিবেশ এবং মান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য

অরুণলাল: – আমার বিচারে --আমি কঠোর মন্তব্য করতে চাই না, তবুও আমার নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে – কলকাতায় এখন কোন ক্রিকেট খেলা হচ্ছে না, যা হচ্ছে তা আর যাই হক ক্রিকেট নয়। এখনকার ক্রিকেটে কোন রকমের মোটিভেশন কাজ করে না, কোন চেষ্টা নেই, কোন দলই খেলতে নেমে জেতার চেষ্টা করে না। সবাই যেন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মনের ভাব এমন যে খেলতে হয় খেলছি, যা হয় হবে। পরিষ্কার করেই বলছি পৃথিবীর কোথাও ঠিক এ ধরনের চিন্তায় বা মেজাজে ক্রিকেট খেলা হয় বলে আমার জানা নেই। ব্যতিক্রম হিসাবে হয়ত-দু-একটি ক্লাবের নাম করা যাবে, এছাড়া অন্য সমস্ত ক্লাবেরই কোন রকমে মরসুম কাটান ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই। ছোট ক্লাবগুলির হয়ত আর্থিক সমস্যা এবং অন্য কিছু সমস্যা আছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ক্লাবগুলির ঝিমিয়ে থাকার কারণ কি? মাঠে খেলতে নেমে আর্থিক অবস্থার জন্যই কি আক্রমণাত্মক বা পজিটিভ মানসিকতার ক্রিকেট খেলতে কোন অসুবিধা হয়?

যে কয়েক বছর আমি কলকাতায় ক্রিকেট খেলছি তাতে আমি দেখেছি এখানে প্রতিভার বা যোগ্য এবং সম্ভাবনাময় ক্রিকেটারের কোন অভাব নেই। কিন্তু এই সব তরুণ ক্রিকেটারদের নিজেদের উপরেই কেমন যেন আস্থা নেই, নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে বাড়ানর জন কোন উদ্যোগ নেই। এদের দেখে মনে হয় এরাও প্রচলিত ধারায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ভারতের অন্য রাজ্যের সংগে এখানকার ছেলেদের খেলার যোগ্যতার ব্যাপ্যরে কোন বিশেষ পার্থক্য নেই,

● দিল্লির ক্রিকেটের সংগে কলকাতার ক্রিকেটের তফাৎ কোথায়?

অরুণলাল: – আগেই বলেছি যোগ্যতার কোন রকম পার্থক্য নেই। একটাই তফাৎ যে দিল্লির ছেলেরা একটু বেশি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে। মেজাজে ও মানসিকতায় দিল্লির উইকেটও কলকাতার মত নয় একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। দিল্লিতে স্থানীয় লীগ ক্রিকেট আমি খুব বেশি খেলি নি। বস্তুতপক্ষে খুবই সামান্য খেলেছি। দিল্লিতে আমার ক্রিকেট খেলা ছিল প্রধানত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট। পরবর্তী পর্যায়ে রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ইত্যাদি। তবে সবত্রই উইকেটের মান ভাল। ভাল উইকেটই ভাল ক্রিকেট খেলতে উৎসাহ দেয়, সেখানে বোলার ও ব্যাটসম্যান উভয়েই প্রায় সমান সুযোগ পায়। খারাপ উইকেট থেকে কখনও ভাল ক্রিকেট এবং ভাল ক্রিকেটার পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।

● আপনার দিল্লি ছেড়ে চলে আসার কারণ কি? যদি একান্ত ব্যক্তিগত না হয় –

অরুণলাল: না, কোন বিশেষ ব্যক্তিগত কারণ নেই। কলকাতার আমার বর্তমান চাকুরীই আমার জীবনের প্রথম চাকুরী। সুতরাং জীবিকার প্রয়োজনেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আমি প্রথমদিকে এখানে চাকুরী করে দিল্লির পক্ষেই খেলা চালানর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু নিয়মিত ম্যাচ প্র্যাকটিস ও নেট প্র্যাকটিসের অভাব এবং এতদূরে যাওয়া আসার ঝামেলার জন্য কলকাতাতেই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাছাড়া চাকুরীর জন্য বাকি জীবন ত এখানেই কাটাব। সুতরাং ক্রিকেটও এখানেই খেলব। এ ব্যাপারে অবশ্য আমার কোম্পানি আমাকে বিস্তর সাহায্য করেছে এখনও করছে। এক দিক থেকে আমার কোম্পানি 'স্টুয়ার্ট হল ইন্ডিয়া লিমিটেড' অরুণলাল নামে একজন ক্রিকেটারকে স্পনসর করেছে বলতে পারেন। ছুটি ইত্যাদির ব্যাপারে,

আমার কখনও কোন অসুবিধা হয় নি। আমার সহকর্মীরাও এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিশীল।

● দিল্লির ক্রিকেট নিয়ে বিষাণ বেদির সেই লড়াই প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?

অরুণলাল – প্রাথমিক ভাবে খেলোয়াড়রাই কর্মকর্তাদের কাছে ক্রিকেটারদের সুবিধা, অসুবিধা এবং স্থানীয় ক্রিকেটের উন্নতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছিল। খেলোয়াড়দের সেই আবেদন জানানর কাজে বেদি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে ব্যাপারটি প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং সেই সময় বেদি ছিলেন চলন্ত শক্তির উৎস।

● বেদির সঙ্গে আপনার অনেক দিনের সম্পর্ক – কেমন অধিনায়ক ছিলেন তিনি?

অরুণলাল – বেদি দারুণ অধিনায়ক, আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। দলের খেলোয়াড়দের লড়াই-এ উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে বিষাণ বড় ভূমিকা নিতেন, ক্রিকেটারদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তাও দেখার মত ছিল।

● বেদি, সুনীল ও কপিল – সাম্প্রতিক কালে ভারতের এই তিন অধিনায়কের নেতৃত্বেই আপনি খেলেছেন। অধিনায়ক হিসাবে আপনি এই তিনজনের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করবেন।

অরুণলাল – আমার ক্রিকেট-জীবনের প্রথম পর্ব বেদির ছত্রছায়ায় কেটেছে। সেই দিক থেকে সুনীল ও কপিলের অধিনায়কত্ব দেখার সুযোগ সামান্যই পেয়েছি। আমার ক্রিকেট দেখা, জানা ও বোঝার ব্যাপারটা অনেকটা বেদির অধিনায়কত্বে ঘটেছে। পক্ষান্তরে সুনীলের নেতৃত্বে খেলার সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সুনীলের নেতৃত্বে খেলার সময়ে সে আমাকে সব সময়েই উৎসাহিত করেছে যা আমার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার। কপিলের নেতৃত্বে আমি মাত্র দুটি একদিনের ম্যাচ খেলেছি – সুতরাং এই তিনজন অধিনায়কের যোগ্যতা বা দক্ষতার তুলনামূলক আলোচনার উপযুক্ত নই আমি।

● বাংলার ক্রিকেটে ফিরে আসি – গোপাল বসু, পলাশ নন্দী ক্রিকেটারদের সঙ্গ এবং মোহনবাগান ক্লাবে ক্রিকেট খেলা – সব মিলিয়ে কেমন লাগছে?

অরুণলাল – দারুণ! গোপাল বসু, পলাশ নন্দী – এদের সবাইকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি। আমার প্রতি আমার ক্লাবের ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছার পরিমাণ মাপা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মোহনবাগান ক্লাব শুরু থেকেই আমার প্রতি খুবই উদার এবং অনুগ্রহশীল বলতে পারি। আমাকে সব সময়েই প্রায় চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারের সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি মোহনবাগান ক্লাবের একটা অংশ হিসাবে গর্ব বোধ করি।

● দিলীপ দোশি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

অরুণলাল – দিলীপ একজন উঁচুমানের ক্রিকেটার, বাংলা দলের পক্ষে সে অসাধারণ বোলিং করেছে। তাকে আমি অত্যন্ত লড়াকু ক্রিকেটার হিসাবেই জানি, অধিনায়ক হিসাবে সে নিজে এগিয়ে এসে দলকে অনুপ্রাণিত করতে চাইত, তার ক্রিকেট-যোগ্যতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।

● এবার আসামের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক চমকপ্রদ জয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

অরুণলাল – ওঃ এটা তো স্বপ্ন সত্যি হয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। কতজন ক্রিকেটার জীবনে এ ধরনের ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য পায় জানি না। শনিবার সন্ধ্যায় আমি আমার স্ত্রী রীনাকে বলেছিলাম যে রবিবার মাঠে যেও অন্য ধরনের ক্রিকেটের দেখা পেলেও পেতে পার। আমি যে জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম – আদৌ তা নয়, তবে আমি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম। কারণ তখনও ৬ ঘন্টার ক্রিকেট বাকি ছিল, কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে।

খেলার শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় আমি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এই জন্য যে আমার মধ্যে যথেষ্ট টেনশন থাকলেও আমার দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে আদৌ কোন টেনশন দেখছিলাম না। সুতরাং মধ্যাহ্ন ভোজের সময় আমি দলের ছেলেদের একটু রূঢ় ভাষাতেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললাম "আমাদের যে ভাবে ব্যাট করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারি নি। তবে এখনও খেলার ৪ ঘন্টা বাকি আছে যদি পরবর্তী দু-ঘন্টার মধ্যে আসাম দলকে আমরা আউট করতে পারি তাহলে এখনও আমাদের জেতার সম্ভাবনা আছে। আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই হচ্ছে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণের শেষ সুযোগ, পারলে এখনই পারতে হবে নইলে আর কখনও পারব না। তোমরা এখন ভারমুক্ত মেজাজে ক্রিকেট খেল, রিল্যাক্সড হলে সেরা দক্ষতা উপস্থিত করতে পারবে। আমাদের এখন কিছুই হারানর নেই। এখন বরঞ্চ আসামই চাপের মধ্যে পড়বে।

● ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরছি – ভারতীয় দলের পক্ষে খেলে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে আপনার ব্যর্থতা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

অরুণলাল: নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক, এর বেশি আর কি বলব।

● আপনার টেস্ট-অভিজ্ঞতা?

অরুণলাল: সংক্ষিপ্ত এবং মধুর। টেস্ট ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতা আমার ব্যাটিংকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কিন্তু আমি মনে করি এখন আমি আরও ভাল খেলছি।

● কলকাতার ক্রিকেটে ছুঁড়ে বল করার ঘটনা এবং মহৎ অভ্যাস কিভাবে কতটা বাংলার ক্রিকেটের ক্ষতি করছে বলে আপনি মনে করেন?

অরুণলাল: 'চাকার' থাকা মানেই ক্রিকেট পঙ্গু হয়ে যাওয়া। কলকাতার এই সমস্যা দূর করার জন্য সবাইকে যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। খেলোয়াড়, কর্মকর্তা এবং অ্যাসোসিয়েশন সবাইকে এ-ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, এটা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা। মনে রাখতে হবে এটা শুধু ব্যাটসম্যানদের সমস্যা নয়। যে সব বোলাররা এই জঘন্য ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা নিজেরাও নিজেদের কবর খুঁড়ছেন, কলকাতার গণ্ডী পেরিয়ে অন্য কোথাও খেলতে গেলে তাঁরা কী করবেন? সংশ্লিষ্ট ক্লাবের তরফ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে যেন কোন 'চাকার' দলে খেলার সুযোগ না পায় এবং নেটেও যেন বল না করে। শুধু দু-একটি ক্লাবের পক্ষে এ কাজ করা কঠিন। প্রতিটি ক্লাবকেই এ-কাজ করতে হবে। আম্পায়াররাও এ ব্যাপারে কঠোর হবেন। ক্রিকেটকে বাঁচানর কাজে তাঁদেরও বড় ভূমিকা রয়েছে।

● সুনীল গাভাসকার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন – সুনীলের টেকনিক, মানসিকতা, কবে অবসর নিলে ভাল হয়, একসঙ্গে খেলেছেন সেই অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন?

অরুণলাল: সুনীল গাভাসকারের মত জীবন্ত প্রবাদ-পুরুষের টেকনিক ও দক্ষতা সম্পর্কে আমি মন্তব্য করব? সুনীলের টেকনিক সম্পর্কে এত কথা বলা হয়েছে, নতুন করে আর কিছু বলার নেই। সত্যিকারের গ্রেট ব্যাটসম্যান। মানসিকতার কোন তুলনা নেই। মনসংযোগ এতই গভীর যে পরিস্থিতির চাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

এটা আমার সৌভাগ্য যে সুনীলের সঙ্গে দুটি টেস্টে ইনিংস শুরু করতে পেরেছিলাম। প্রতি ওভারের শেষে তিনি আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিলেন। একই সঙ্গে খেলছি, অত বড় ব্যাটসম্যান অথচ কখনও আমাকে ওঁর চেয়ে কম যোগ্যতার ব্যাটসম্যান মনে করতে দেন নি।

বস্তুতপক্ষে সুনীল গাভাসকার একেবারেই অন্য জাতের ক্রিকেটার, চ্যাম্পিয়নদের সমস্ত ব্যাপারগুলোই একটু অন্যরকম হয়, আমাদের মত সাধারণ ক্রিকেটারদের ওঁদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা উচিত নয়। এখনও তিনি যে ফর্মে ব্যাট করছেন তাতে আমি তাঁর অবসরের কথা চিন্তাই করতে পারি না। তবে অবসর নেওয়া একেবারেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে আমার কোন মন্তব্য নেই।

● বিদেশ সফর সম্পর্কে কিছু বলবেন?

অরুণলাল: পাকিস্তান সফর আমি খুবই উপভোগ করেছিলাম। অনেক বন্ধুও পেয়েছিলাম। দল থেকে বাদ পড়া সম্পর্কে আমার কোন মন্তব্য নেই। আমার বিরুদ্ধে দুটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলি – ইমরানের বলে ক্যাচটি মুদাস্সর মাটি থেকে নিয়েছিল, কাদিরের বলে এল বি ডব্লু সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও আমি খুব খুশি নই।

● টেস্ট দল থেকে বাদ গিয়ে আপনি কি হতাশ অথবা ক্ষুব্ধ?

অরুণলাল: একেবারেই নয়, আমি সহজে হতাশ হই না।

● আবার টেস্টে ফিরে আসার আশা রাখেন?

অরুণলাল: অবশ্যই, কেন নয়?

● নিজের ব্যাটিং টেকনিক সম্পর্কে কিছু বলবেন? ইনিংস ওপেন করার ব্যাপারে----

অরুণলাল: আমি কখনও বলব না যে আমার ব্যাটিং টেকনিক ত্রুটি-শূন্য। সে অর্থে কারও ব্যাটিংই ত্রুটি-শূন্য নয়। ক্রিকেটে রোজই শিখতে হয়, আমিও শিখছি। আমাকে ওপেন করতে বললে আপত্তি করব না।

● বাংলার অপর ওপেনার প্রণব রায় সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

অরুণলাল: আমি কিছুটা হতাশ, কারণ যোগ্যতা অনুযায়ী তার আরও বেশি কিছু পাওয়া উচিত ছিল।

● অবসরের পর কি ক্রিকেট কোচিং করবেন?

অরুণলাল: এই মুহূর্তে আমি অবসরের কথা ভাবছিই না, তবে ক্রিকেট খুব ভালবাসি। ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকতে চাইব।

● মহিন্দার, মদনলাল, চেতন চৌহান সম্পর্কে কিছু বলুন।

অরুণলাল: দিল্লিতে ক্রিকেট খেলার সময় এদের সঙ্গ আমি দারুণ উপভোগ করতাম। বেদির মত এরা সকলেই আমার ক্রিকেট সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাত। আমাকে কখনও ব্যাট কিনতে হত না। অতি সম্প্রতি আমি কয়েকটি ব্যাট কিনেছি। মহিন্দারের সঙ্গে আমি কলেজেও ক্রিকেট খেলেছি। মদন ও চেতন চৌহান দুজন

অসাধারণ লড়াকু ক্রিকেটার, এদের সকলের কাছ থেকেই আমি অনেক কিছু শিখেছি। সর্বত্র সিনিয়র ক্রিকেটাররা আমাকে ক্রিকেটের সরঞ্জাম উপহার দিয়েছে, দোশি আমাকে ক্রিকেট ব্যাট উপহার দিয়েছে। সিনিয়র ক্রিকেটারদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

● আপনার জীবনে আকাশলালের প্রভাব কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

অরুণলাল: আকাশ আমার জ্যাঠামশাই-এর ছেলে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আকাশলালের বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক দফতরে চাকরি করার জন্য সে আমার সঙ্গে থাকত। ছোটবেলায় আমি আকাশের সঙ্গে মাঠে যেতাম এবং ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছা তখন থেকেই আমার মনের মধ্যে জেগেছিল। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আমাকে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে। যদিও আকাশের সময়ে ভারতে অনেক নামী ক্রিকেটার ছিলেন, তবুও আমি মনে করি আকাশের টেস্ট খেলার সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। তার অনেক অসংখ্য উপদেশের মধ্যে একটি আমি চিরকাল মনে রাখব। চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে আমার প্রথম রনজি ম্যাচে আমি তিনটি বল খেলতে পেরেছিলাম। চন্দ্রর তৃতীয় বলটি আমি লেগব্রেক হিসাবে খেলেছিলাম, আসলে সেটাই গুগলি ছিল। তরপর থেকে আমার এত চন্দ্র-ভীতি এসে গেল যে আমি ঘুমে চন্দ্রর বিরুদ্ধে খেলার কথা ভেবে আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করত। অবশেষে আকাশ আমাকে বলল যে আমি যেন চন্দ্রকে অফ স্পিনার হিসাবে খেলি। তার পরের ম্যাচেই আমি চন্দ্রর বিরুদ্ধে ৮৪ রান করে রান আউট হয়ে যাই। এরপর চন্দ্রকে খেলতে আমার তেমন অসুবিধা হয় নি।

● সামগ্রিকভাবে ক্রিকেট আপনাকে কী দিয়েছে?

অরুণলাল: অনেক কিছু, খেলার আনন্দ ছাড়া বিচিত্র জীবনের অনেক শিক্ষা আমি ক্রিকেট থেকেই পেয়েছি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি অত্যন্ত শান্তিতে আছি তার জন্য ক্রিকেটের অবদান কম নয়। ক্রিকেট ছোট-বড় সমান করে দেয়, দুঃখ ও আনন্দ দুটোই প্রায় একইভাবে নিতে শেখায়। বড় বড় ক্রিকেট ব্যক্তিত্বের কাছে অনেক কিছু শিখেছি।

রনজি ট্রফিতে তখন সবে খেলতে শুরু করেছি, তখনকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। দিল্লি খেলছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে, সার্ভিসেসের একজন ব্যাটসম্যান ব্যাট করছে, বল করছিলেন বেদি। আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং-এ আমি সিলি-পয়েন্টে, রাকেশ ফরোয়ার্ড শর্ট লেগ। বেদির একটি বল ঠিকমত খেলতে না পারায় ব্যাটের কানায় লেগে শর্ট লেগের দিকে সামান্য উঁচু হতেই রাকেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরে আবেদন জানাতেই আম্পায়ার আউট ঘোষণা করলেন। কিন্তু বেদি চেঁচিয়ে উঠে ধমক দিলেন – 'দ্যাটস নট অ্যাপিল, রকস্', আম্পায়ারের কাছে আবেদন ফেরত নেওয়া হল। ক্রিকেটে যে মনোভাব নিয়ে খেলতে হয় তার শিক্ষা আমি সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলাম।

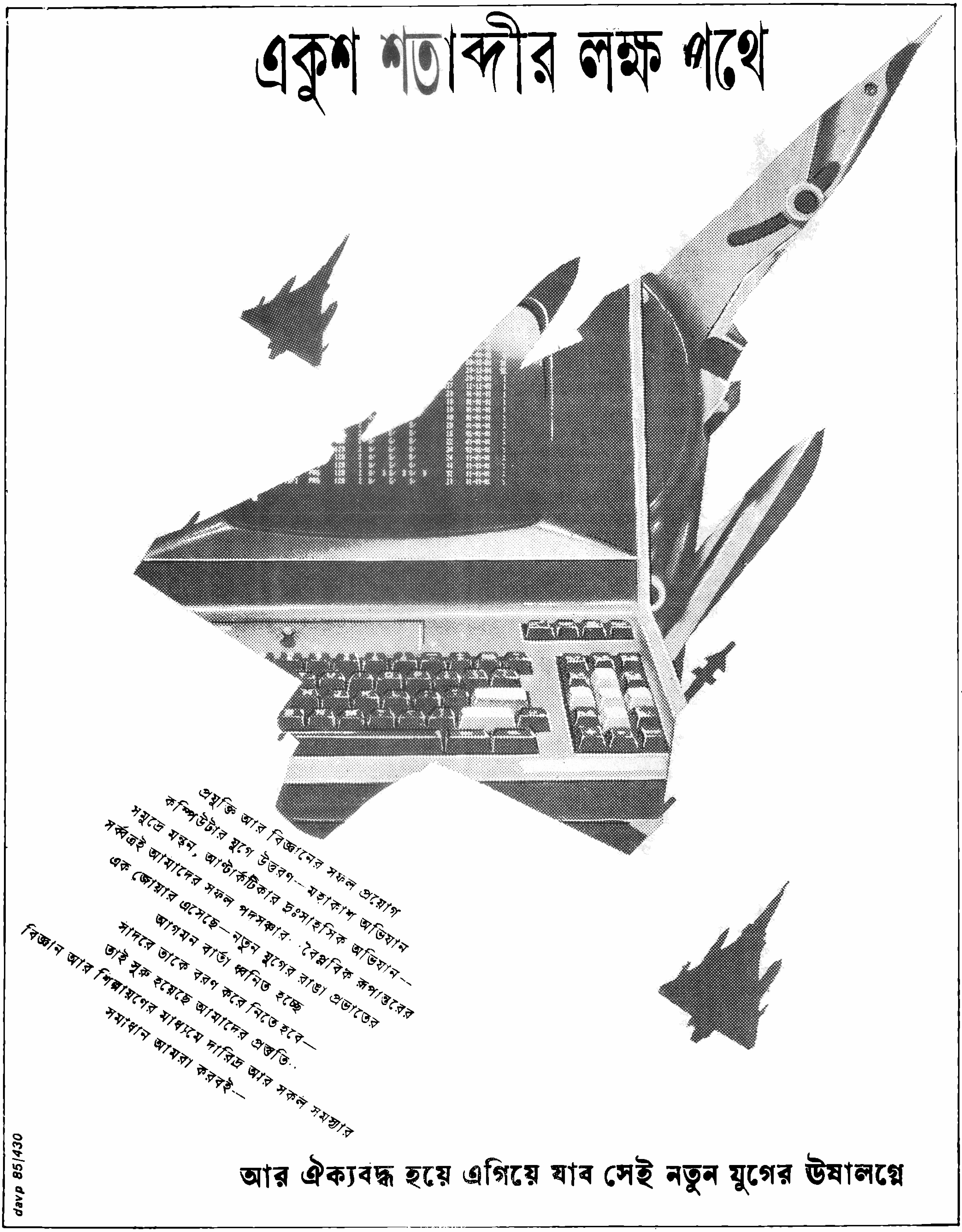
আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে দিল্লির প্রথম দিকে কয়েকটি উইকেট দ্রুত পড়ে যাওয়ার পর মদন এবং আমি রান পেয়েছিলাম। মদন ২00 রান করেছিল, আমি ১০৮ রান করে অপরাজিত ছিলাম। পরের দিন আমি প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলা শুরু করেছিলাম। প্রথম কয়েক ওভারের মধ্যে কয়েকটি বাউন্ডারি মেরে যখন বড় ইনিংসের জন্য তৈরি হয়েছি তখন হঠাৎ সেলিম দুরানির বলে বোল্ড হয়ে গেলাম। বলটি লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়ে ঘুরে আমার অফ স্টাম্পের বেলটি নিয়ে চলে গেল। দুরানির বোলিং-এর বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ছিল ওভারের মধ্যে কয়েকটি সামান্য স্পিন করিয়ে একটি বা দুটি বল অনেকটা স্পিন করান, কিন্তু আমি যে বলটিতে আউট হয়েছিলাম সেটা অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় ফুটখানেক স্পিন করেছিল। প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছিলাম নিজের ওপরে এবং ভেবেছিলাম ঐ বলটি 'ফ্লুক' হঠাৎ হয়ে গেছে।

তখন একেবারে তাজা তরুণ ছিলাম ত সেজন্য সব কিছুতেই প্রচন্ড উৎসাহ ছিল এবং অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ছিল শূন্য। দুরানি ব্যাট করছিলেন, বল করছিল রাকেশ। 'আমি ফিল্ড করছিলাম স্লিপে। রাকেশের একটি বল লেট কাট করতে গেলে বলটি একটু শূন্যে ভেসে আমার বাঁ দিক দিয়ে উড়ে গেল, আমি প্রাণপনে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পেলাম না। মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে প্রাণপনে ছুটেও বাউন্ডারি বাঁচাতে পারলাম না। উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। পরের বল (ওভারের চতুর্থ বল) করার আগে আমি চেঁচিয়ে রাকেশকে বললাম 'ঠিক ওখানে বল ফেল এবং ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দাও।' দুরানি ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে আমাকে দেখলেন। একটু হাসলেন, কিছু বললেন না। পরের তিনটি বলে লেট কাট করলেন এবং প্রতিবারই বল আমার পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বাউন্ডারিতে পৌঁছল। আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে ছুটলাম এবং বল ছুঁতে পারলাম না। শেষ বলটি ফুলটস ছিল, দুরানি সেটি মাঠের যে কোন জায়গায় পাঠাতে পারতেন, ইচ্ছে করলে মাঠের বাইরেও পাঠাতে পারতেন, কিন্তু সেটিও সেলিম লেট কাটের মত করে আমার পাশ দিয়ে স্টিয়ার করলেন। ওভার শেষ হল, আমার অবস্থা ---- আন্দাজ করতেই পারছেন। আমি এগিয়ে গেলে সেলিম আমায় বললেন – "ভাইয়া, হাম ভি থোড়া ক্রিকেট খেলা হ্যায়।" আমি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলাম। সেই থেকে আমি সেলিমের ফ্যান।

ক্রিকেট অসাধারণ খেলা, আমি ত এর বৈচিত্র্যে এখনও মুগ্ধ ছাত্র হয়ে খেলছি।

অরুণলাল : এ-ক-ঝ-ল-কে

পুরো নাম	অরুণলাল
ডাক নাম	পিগি
জন্ম তারিখ	১-৮-১৯৫৫
উচ্চতা	পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি
ওজন	৬৬ কিলোগ্রাম
ছাতি	৩৮ ইঞ্চি
চোখের রঙ	কালো
প্রিয় রঙ	নীল
প্রিয় মাঠ	ইডেন গার্ডেন
প্রিয় ফিল্ডিং করার জায়গা	সিলি পয়েন্ট
প্রিয় স্ট্রোক	স্কোয়ার কাট
প্রিয় ক্রিকেটার	ভিভ রিচার্ডস
প্রিয় ফুটবলার	পেলে
প্রিয় ক্রীড়াবিদ্ (ক্রিকেটের বাইরে)	জন ম্যাকেনরো
প্রিয় অবসর বিনোদন	বই পড়া
প্রিয় ছুটি কাটানর জায়গা	কাপুরথালা
স্মরণীয় ইনিংস	এবারের রনজি ট্রফিতে ইডেন গার্ডেনে আসামের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংস
স্মরণীয় ঘটনা	জাতীয় দলে প্রথম নির্বাচিত হওয়ার মুহূর্ত
প্রিয় টেলিভিশনে দেখা (শোনা)	ইংরেজীতে খবর পড়া
প্রিয় অভিনেতা	সিলভেস্টার স্ট্যালোন
প্রিয় অভিনেত্রী	জ্যাকলিন বিসেট
প্রিয় গায়ক	মেইল কেপলার
পছন্দ	ক্রিকেট খেলা, গান শোনা, খাওয়া এবং শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখা
অপছন্দ	অসততা
গাড়ি	মারুতি, নাম্বার WNF 715
উদীয়মান ক্রিকেটার	গৌতম ঘোষ (জুনিয়র) এবং উৎপল চ্যাটার্জি
লক্ষ্য	সুখী এবং শান্তিপূর্ণ জীবন
সংস্কার	কিছুই না
প্রিয় খাদ্য	স্ত্রীর হাতের যে কোন রান্না
প্রিয় পানীয়	শ্যাম্পেন
প্রিয় হবি	যে কোন ভাল কাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া


একুশ শতাব্দীর লক্ষ্য পথে
প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ
কম্পিউটার যুগে উত্তরণ—মহাকাশ অভিযান
সমুদ্রে মন্থন, আণ্টার্কটিকার দুঃসাহসিক অভিযান—
সর্বত্রই আমাদের সফল পদসঞ্চার. বৈপ্লবিক রূপান্তরের
এক জোয়ার এসেছে—নতুন যুগের রাঙা প্রভাতের
আগমন বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে
সাদরে তাকে বরণ করে নিতে হবে—
তাই সুরু হয়েছে আমাদের প্রস্তুতি.
বিজ্ঞান আর শিল্পায়ণের মাধ্যমে দারিদ্র আর সকল সমস্যার
সমাধান আমরা করবই—
আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাব সেই নতুন যুগের উষালগ্নে
davp 85/430

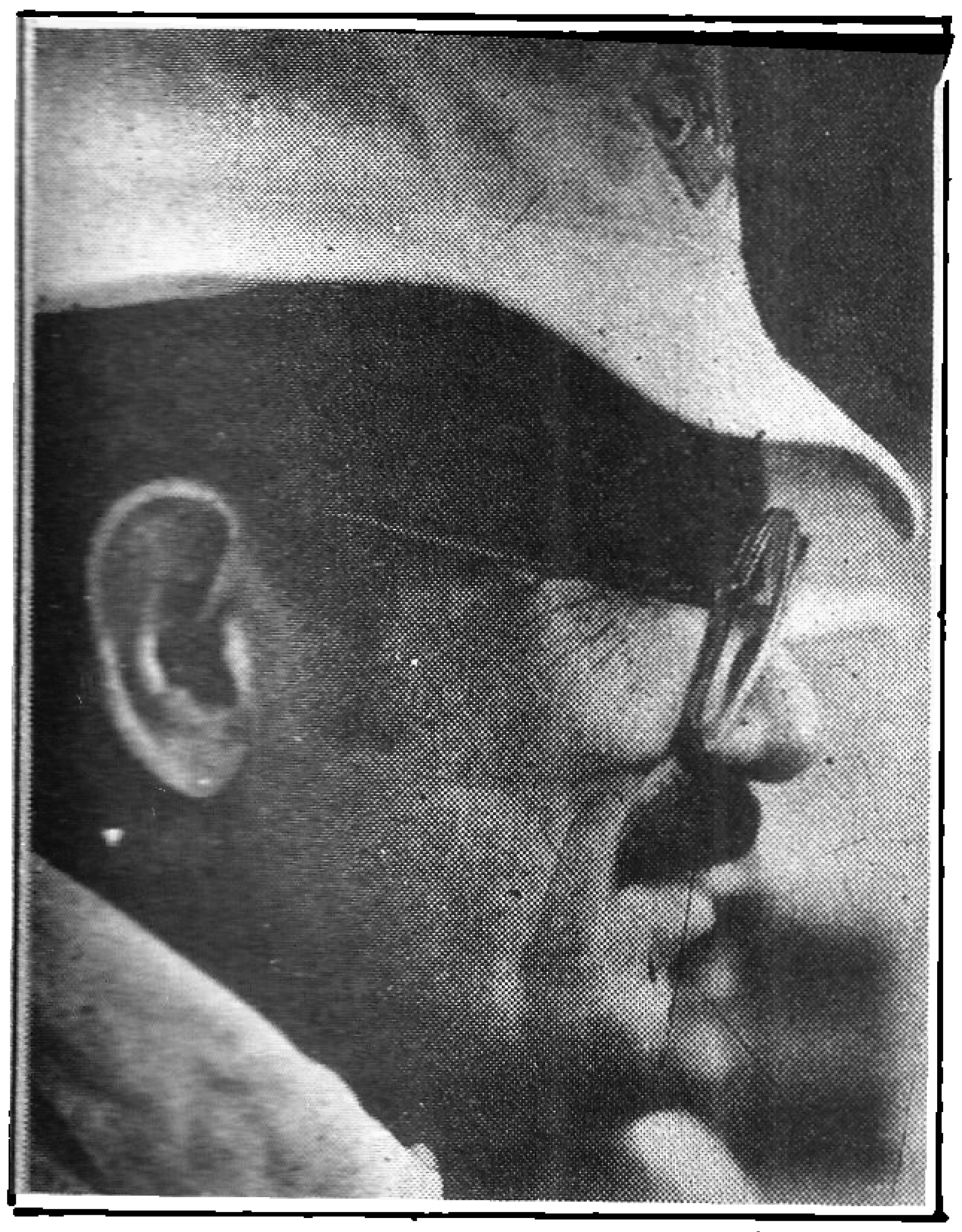
বোম্বাই ডায়েরী

শিরাজী দাশগুপ্ত

হার-না মানা অশোক

প্রয়াত ভিনু মানকড় পৃথিবীর সেরা অল-রাউন্ডারদের মধ্যে একজন ছিলেন। সর্বকালের নিরিখেও তাঁর তিনপুত্র পরবর্তীকালে ক্রিকেট খেলেছেন এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটই খেলেছেন। যদিও পিতা ভিনুছোট ছেলে রাহুল সম্পর্কে বেশি আশাবাদী ছিলেন, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বড় ছেলে অশোকই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। প্রথমত টেস্ট খেলার সূত্রে এবং দ্বিতীয়ত তাঁর অসাধারণ ক্রিকেট জ্ঞানের জন্য। আমাদের এই ছোট্ট লেখার নায়ক অশোক মানকড়।

অশোক লেখাপড়ায় ভাল। রনজি ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের মতন শক্তিশালী দলে নিজের জায়গা সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন বহুদিন। অধিনায়কত্বও করেছেন শেষ কয়েক বছর। অধিনায়ক হিসাবে প্রচুর বিশেষজ্ঞের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তবে উত্তর পর্বে ভাল জীবনযাত্রার জন্য বম্বের ক্রিকেট মহলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি। খুব অল্প বয়সেই মফৎলাল গ্রুপে ভাল চাকরি জোগার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে টেক্সটাইল ইনডাস্ট্রির নানা সমস্যার ফলে যখন মফৎলাল কর্তৃপক্ষ ক্রীড়াবিদদের সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে বহু খেলোয়াড়কে রাতারাতি বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেন, তখন মানকড়ও এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে আসেন



টেস্ট খেলোয়াড়, বড় চাকুরে বিখ্যাত স্ত্রী, ইত্যাদি টাইটেল [illegible] বজায় রেখে তাঁকে নিশ্চয়ই প্রথম দিকে অনেক দুর্ভাবনার মধ্যে সময় কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সব [illegible] এবং বাধা অতিক্রম করে অশোক মানকড় এগিয়ে এসেছেন। অধুনা অভিজাত কাফ প্যারেড অঞ্চলে একটি 'ফাস্ট ফুড'-এর দোকান করেছেন। [illegible] নিজে এই দোকানটির দেখা-শোনা করেন। [illegible] সম্পূর্ণ পেশাদারী ভিত্তিতে দুটি [illegible] ক্রিকেট কোচিংয়েও হাত দিয়েছেন। একটি মফৎলাল এবং অন্যটি রেলওয়ে। ক্রিকেট কমেন্টারি এবং [illegible] আসরের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। এসব ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি পেশাদার, [illegible] নেই।

মধ্যপ্রদেশ কোচিং এবং দল নির্বাচনের ব্যাপারে অশোক মানকড়কে ইন্দোরে যাতায়াত করতে হত প্রায়ই। সম্প্রতি ইন্দোরের একটি দল নির্বাচনী সভায় [illegible] অশোক একটি ম্যাচের পর চটপট [illegible] খেলোয়াড়কে প্রাথমিকভাবে বেছে নিয়ে বললেন, "আমরা কত তাড়াতাড়ি এই কয়েকজনকে বেছে নিলাম। কারণ এদের সঙ্গে অন্যাদের তফাৎ অনেক। বোম্বাই হলে এমনটি হতনা। ওখানে একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ উনিশ-বিশ। যার ফলে বেছে নেওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার।" অর্থাৎ বোম্বাই ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা আজও অম্লান। আপাত দৃষ্টিতে মানকড় আর তেমনভাবে বোম্বাই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত নন। মনে হয় না তেমন কোন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন বি সি এ থেকে তাঁর দুঃসময়ে। তবু বোম্বাই ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর ধারণা অটুট।

অবশ্য অভিমানের সুর বেজেছে পুত্র মিহিরের খেলা নির্বাচনের ব্যাপারে। সত্যি কথা স্ত্রী নিরুপমা মহিলা টেনিসের ক্ষেত্রে একটি বড় নাম। হয়ত বা পিতা অশোকের প্রিয় খেলার প্রতি মিহির কোনদিন আকর্ষণ অনুভব করেনি। হয়ত অশোক নিজে ছেলেকে এই খেলার সঙ্গে জড়াতে চাননি। তবে মিহির আজ বোম্বাইয়ের অন্যতম সেরা উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড়। ছেলেটিকে উৎসাহ দিতে কোর্টের পাশে হাজির থাকছেন তার মা ও বাবা। অশোক বোধকরি বোম্বাইয়ে ক্রিকেট মাঠের থেকে টেনিস কোর্টের ধারেই হাজির থাকছেন বেশি। কথা উঠলে বলেন, "আমি ত আর জোর করে ছেলেকে ক্রিকেট খেলাতে পারিনা।"

বাঁধন খোলার পালা

বোম্বের চার্চগেট স্টেশনের কাছে একটি নার্সিং হোমে দুর্ঘটনায় আহত এক সহকর্মীকে দেখতে গিয়েছিলাম। ঐ একই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন এক ভদ্রমহিলা। ফেরবার পথে সিঁড়িতে এবং করিডরে কথা বলতে বলতে জানলাম এই প্রবীণা মহিলার স্বামী বছর দুয়েক আগে অবসর গ্রহণের পরে পরেই মারা গিয়েছেন। ভদ্রলোক বোম্বের একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেও হকির ব্যাপারে বেশ উৎসাহী মনে হল। উল্টো দিকেই বি এইচ এ-র স্টেডিয়াম এবং এই মাঠের নানা স্মৃতি তাঁকে ভারাক্রান্ত করল মানসিক দিক দিয়ে। জানা গেল তাঁর স্বামী হকি বিশেষজ্ঞ হিসাবেই বেশি কাজ করেছেন এবং বয়সকালে হকি খেলেছেনও অল্প বিস্তর। আলাপ জমাবার ফাঁকে একটি ট্যাকসি ধরে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। তাঁরও গন্তব্যস্থল কাছাকাছি, তাই লিফট দিতে কোন অসুবিধা হল না।

এই কাগজের সঙ্গে ক্রিকেট সংবাদিক কে এন প্রভু জড়িত ছিলেন বহুদিন ধরেই। সামান্যতম ক্রিকেট কভারেজের সুবাদে প্রভুকে দেখেছি প্রেস বক্সে বার কয়েক। পুরো হাতা জামা, টাই-এর নটের পারিপার্ঘ্য পুরু লেন্সের চশমা একটা গাম্ভীর্য নিয়ে দেখা দিত। ভদ্রমহিলার কাছেই শুনলাম প্রভু আজ অবসর প্রাপ্ত। খবরটা আমার জানা ছিল না। শুধু মনে পড়ল দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে এই ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার কথা। বোম্বের মতন জায়গাতেও তাঁকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হিসাবে অনেকে মেনে নিয়েছেন। এই মেনে নেওয়াটা দ্বিধায় না নির্দ্বিধায় তা বলা কঠিন। কারণ সে সময় দৈনিক পত্রিকার দুনিয়ায় এঁদের রমরমা এবং একতরফা রাজত্ব। আজ কিছুটা প্রতিযোগিতা বেড়েছে। এ হেন ইংরেজী দৈনিকের স্পোর্টস এডিটর বড় চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তবে আমি আগেও শুনেছিলাম যে প্রভু সাহেবের সঙ্গে তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্ক খুব হৃদ্যতার ছিল না। কারণ দুটি-ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কাউকে বিশেষ ভিড়তে দেন নি এবং বিদেশ সফর গুলি কোম্পানীর পয়সাতে তিনিই নিজেই নিতেন। এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে লড়াইও তাঁর হত প্রায়ই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জিততেন প্রভুই। ভদ্রমহিলা বললেন, কতবার যে প্রভুর বিদেশ যাবার ব্যাপারে অন্যান্য সহকর্মীরা টেনশানে ভুগেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ম্যানেজমেন্ট "হ্যাঁ" বলত একেবারে শেষ মুহূর্তে এবং সেই সুবাদে সকলের দৌড়াদৌড়ি পড়ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ভিশা অফিস ইত্যাদি স্থানগুলিতে।

প্রভু ক্রিকেটকে কী দিয়ে গেছেন জানি না তবে অজিত ওয়াদেকারকে তাঁর অন্যতম ক্রিকেট পুস্তক "মাই ক্রিকেটিং ইয়ার্স" লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এর জন্য প্রভুর প্রচারও বড় কম হয় নি। অনুলেখক হিসাবে ছবি সমেত অনেক প্রচার তিনি পেয়েছেন। পরবর্তীকালে অন্য কয়জন সাংবাদিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোন কোন বিশেষ ক্রিকেটারকে বিশ্রী ভাবে আক্রমণ করেছেন। গাভাসকারকে বাতিলের পাতায় রাখার ব্যাপারেও এগিয়েছিলেন একদা। কিন্তু আজ অবসর প্রাপ্ত এই ক্রীড়া সাংবাদিক কি একবারও নিজের ভুলের জন্য ভাবেন– নয় হাজারে রান ও বত্রিশটি সেঞ্চুরির পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই কিংবদন্তীর দিকে তাকিয়ে।

এই বহুল প্রকাশিত 'বনেদী' পত্রিকায় আপাতত: স্পোর্টস এডিটর বলে কেউ নেই। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে কেউ হবেন। আবার হয়ত প্রভুর উপযুক্ত বিকল্প না পাওয়ার ফলে ঐ পদ শূন্যই রেখে দেওয়া হবে তবে ইদানীং কালের অন্যতম সম্মানীয় ক্রিকেট সাংবাদিক কে এন প্রভুর জন্য দুঃখ হয়। তাঁর পদ মর্যাদা ও গ্রুপের জোরে কত রথী মহারথীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন, আর আজ অবসরের পর সেই বাঁধন খোলবার দিন এসে গেছে!

সুখদুঃখের ফুটবল



তুলসীদাস বলরাম

(সাতাশি)

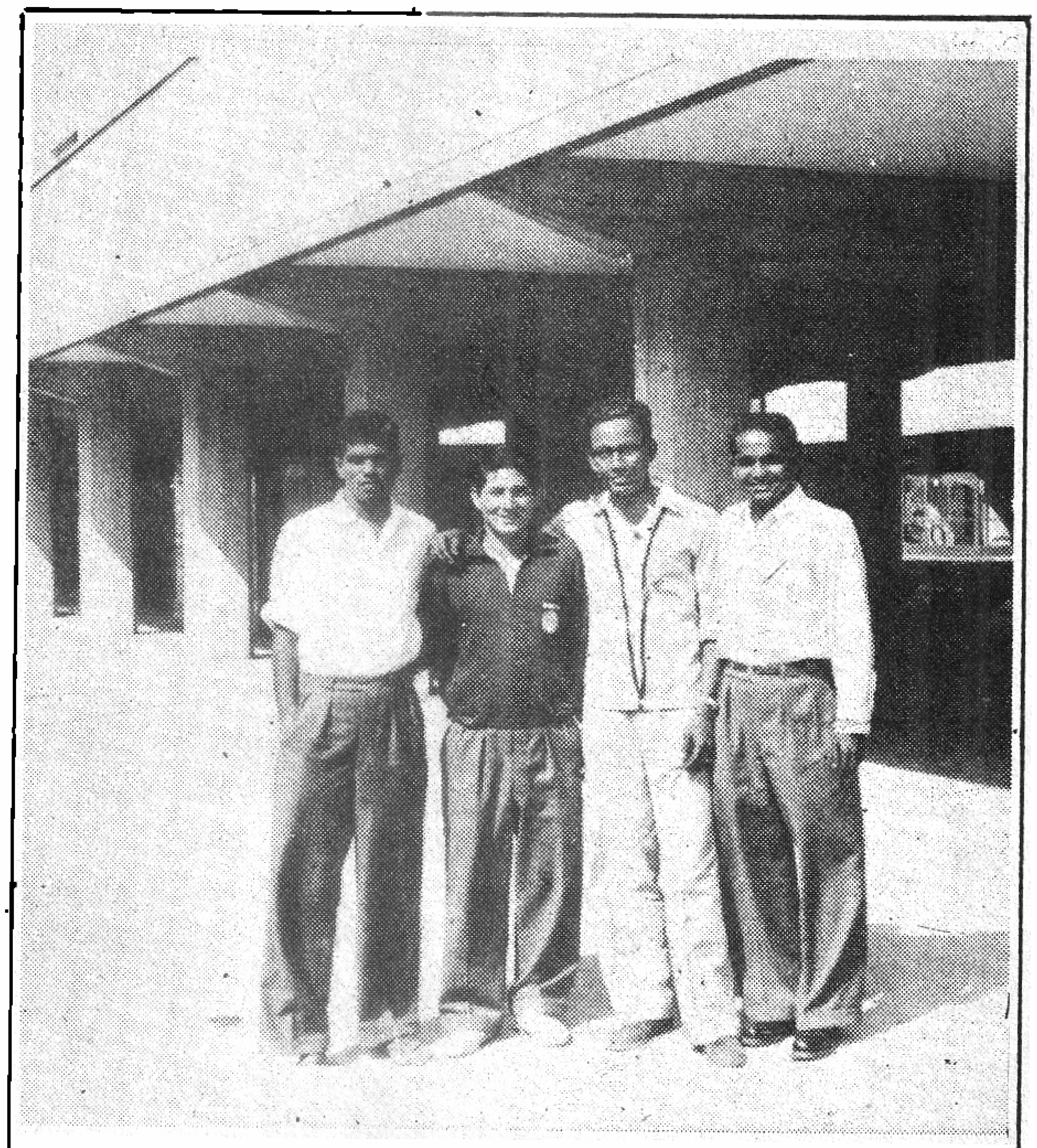
দ্বিতীয়ার্ধে আরও গোল পেতাম। আমরাও যে ম্যাচে ফিরে আসতে পারি, আধিপত্য বিস্তার করতে পারি এই ধারণাটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরে দলের সবাই বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমি শেষদিকে একটা গোল মিস করলাম। 'ওয়াল' খেলে দ্রুত এমন জায়গায় চলে যাই, দেখি যে গোললাইনে পৌঁছে গেছি। 0 ডিগ্রি কোণ, প্রথম পোস্ট থেকে গজ দুয়েক দূরে। গোলকীপার খুব চালাকি করল। ও পোস্টের গায়ে ঠেসে দাঁড়াল। এখন আমি কী করব? হয় ব্যাকপাস করতে পারি নয়ত ভগবানের নামে কষিয়ে শট নিতে হবে, তাতে হাঙ্গেরির গোলকীপারের গায়ে লেগে যদি গোল হয় ত হল। চোখ তুলে নিমেষের মধ্যে তাকালাম। দেখি ব্যাকপাস করলে বলটা নষ্ট হবে, কারণ আমার দলের প্রায় কেউ ধারে কাছে নেই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মুহূর্তের ভগ্নাংশ ছিল, ওদিকে ষাঁড়ের মত তেড়ে আসছে হাঙ্গেরির ডিফেন্ডার।
চোখ বুজেই মারতে হল। বলটা গোলকীপারের গায়ে লেগে কর্নার!

শেষ দশমিনিট আর ফুটবল হয় নি। যদি ভিডিও থাকত, এখন সবাইকে দেখান যেত খেলাটা। সারাক্ষণ হাঙ্গেরির দিকে বল ছিল। আমাদের মরণফাঁস মুক্ত করে দম নেবার সযোগ পায় নি ওরা। যা করা সম্ভব একটা ইউরোপীয় দলের পক্ষে, তাই করল। জামা প্যান্ট টেনে ধরে রাখল পি কে, চুনী এবং আমাকে! থঙ্গরাজকে আর একটাও বল ধরতে হয় নি। জার্সি টেনে রেখেও যখন ওরা দেখল আমরা দমবার পাত্র নই, শুরু হল যথেচ্ছ পা চালান। কপাল খারাপ, এত করেও আর একটা গোল শোধ দিতে পারলাম না। ম্যাচ শেষের বাঁশি বেজে গেল। ম্যাচ আমরা হারলাম বটে, কিন্তু শুরুতে যে সব দর্শক আমাদের দেখে মুচকি হেসেছিল তাদের মন কিন্তু আমরা জিতে নিলাম।

হোটেলে ফিরে রোম যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হল। তার আগে হাতে সময় আছে অনেকটা। শহর ঘুরে দেখা যাক এই ভেবে আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। অ্যাকুইনো ছোট্ট শহর। ফুটবলে প্রবল প্রতিপক্ষ হাঙ্গেরিকে আমরা নাস্তানাবুদ করেছি, এ খবরটা শহরে চাউর হয়ে যায়। দোকানে, রাস্তায়, রেস্তোঁরায় আমাদের ঘিরে ধরল প্রচুর লোক! কারও বায়না অটোগ্রাফ চাই! কেউ শুধু ছবি তুলতে চায়। কেউ আবার আমাদের গায়ে একবার ধরতে পারার আবদার জুড়ল! অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, শেষে পুলিস আমাদের উদ্ধার করে হোটেলে ফিরিয়ে আনল। এসব কারই বা খারাপ লাগে? আমরা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতে লাগলাম।

রাতে ডিনার ছিল। বেশ কয়েকজন ইতালীয়র সঙ্গে আলাপ হল। তাদের মুখে শুধু দুটি প্রশ্ন – তোমরা ভারতের কোন শহর থেকে এসেছ? বোম্বাই না বাঙ্গালোর? আমরা একটু অবাক। বোম্বাই না হয় জনপ্রিয়, তার কারণ আছে। বাঙ্গালোরের কথা ওরা কীভাবে জানল? ওদের মধ্যে কয়েকজন ভাঙা ইংরেজীতে বোঝাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক ইতালীয় যুদ্ধবন্দীকে বাঙ্গালোরে রাখা হয়।

মনে পড়ল স্ট্যাফোর্ডে বেশ কয়েকবছর ইতালির কয়েদীদের একটা দল ফুটবল খেলত। কেম্পিয়া বলে উঠলেন – হ্যাঁ, আমার বাড়ির একটু দূরে ইতালীয় একটি সেটেল্‌মেন্ট আছে। আশ্চর্য, এতদিনের কথা এ বিদেশীরা কীভাবে মনে রেখেছে!



রোমের অলিম্পিক ভিলেজে বলরাম, রামবাহাদুর,
এক বন্ধু এবং কেম্পিয়া

পরদিন রোম পৌঁছই দুপুরে। অলিম্পিক ভিলেজে এসে শান্তি কোথায়? অন্য ইভেন্ট দেখতে পারছি না। রহিমসাহেবের কড়া নির্দেশ – বেশি ঘোরাফেরা করা যাবে না। পরের ম্যাচ গ্র্যাসিডো বলে এক শহরে। রোম থেকে অনেকটা যেতে হবে। প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। সুতরাং মধ্যবর্তী সময় যেন আমরা শুধু বিশ্রাম নিই। পরিষ্কার পালালাম! হকি দেখব না, তা হয় না। হকিতে ভারত আর হল্যান্ডের খেলা ছিল, স্টেডিয়ামে চলে গেলাম। ছাপান্নর ভারতের সব কটা হকি ম্যাচ দেখেছি।

ষাটে কিন্তু ভারতীয় দলকে খেলতে দেখে মনে দারুণ কষ্ট হল। জঘন্য খেলল আমাদের দল। সবচেড়ে দুর্ভাগ্যজনক, অধিনায়ক আবার আমাদের ঘনিষ্ট লেসলি ক্লডিয়াস। ভারত সোনা পায় নি। ষাটের অলিম্পিক দেখে বুঝলাম আমাদের হকিতে অগ্রগতি হয় নি। সবাই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। অন্য দিকে ইউরোপ দ্রুত উঠে এসেছে, নিজেদের উন্নত করেছে।

ফুটবলে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে আমাদের পারফরমেন্স কিন্তু ভারতীয় শিবিরের সবাইকে দারুণ অনুপ্রাণিত করেছিল। সবাই খবর পেয়ে ছুটে এল, অভিনন্দন জানাল। অ্যাথলীটরা এল, এল ওয়েট লিফয়াররাও। শুধু হকি খেলোয়াড়রা আসে নি, কেন জানি না ওরা ফুটবলারদের খুব একটা পছন্দ করত না। সবচেয়ে মজা হল ওয়েট লিফটাররা আসতে। একে পাহাড়ের মত চেহারা! উচ্ছ্বাসে আমাদের জড়িয়ে ধরতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। ওরা বলল বহুত আচ্ছা। শুনলাম তোমরা হাঙ্গেরিকে কাঁধে খুব ঘষে দিয়েছ। চালিয়ে যাও। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। গুড লাক।

(ক্রমশ)

HELA 24 JANUARY 1986
Registration No. 37823/82

সন্দীপ মুন্সী/ছবি–সুমন চট্টোপাধ্যায়

